আফগান জিহাদে বাংলাদেশী যুবকের সফল অপারেশন আর চাঞ্চল্যকর এক
বিমান ছিনতাইয়ের উপর ভিত্তি করে অসাধারণ ঈমানদৃপ্ত উপন্যাস ॥

অপারেশন মাজার-ই-শরীফ

মাসউদ আল আযহারী

অপারেশন মাজার-ই-শরীফ

মাসউদ আল আযহারী

[সংযুক্ত পুস্তক ঃ কথাশিল্পী আহমাদ হাসান দানী রচিত
'বিশ্ব কাঁপানো বিমান ছিনতাই ঘটনা']

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[একটি ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশনা]

অপারেশন মাজার-ই-শরীফ

মাসউদ আল আযহারী

❑

বিশ্ব কাঁপানো বিমান ছিনতাই ঘটনা

আহমাদ হাসান দানী

❑

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়

শফিকুল ইসলাম (শফিক)

❑

❑

প্রকাশনায় ঃ

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ০১৭১-৯৫৫২৭১

০১৭১-৮৪৫৩৩৭

❑

প্রথম প্রকাশ ঃ

আগষ্ট ঃ ২০০৩

❑

মূল্য ঃ সত্তুর টাকা

প্রসঙ্গত

অপারেশন মাজার-ই-শরীফ আফগানিস্তানের উপর সোভিয়েত আগ্রাসনের সময়কার প্রতিরোধ যুদ্ধ ও আদর্শিক জিহাদের এক স্মারক উপন্যাস। মাসউদ আল আযহারীর শক্তিশালী কলমে তৈরি এ উপন্যাস প্রথমবার সম্পাদনা করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় অন্য শিরোনামে। এবার এটি পুনরায় পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে 'অপারেশন মাজার-ই-শরীফ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত আলোকিত তরুণ মাসউদ আমাদের প্রিয় নবীন লেখকদের অন্যতম। আশা করি ইসলামের পক্ষে কলমযুদ্ধে তিনি ভবিষ্যতেও সমভাবে সক্রিয় থাকবেন।

গ্রন্থের অপর অংশটি একজন স্বনামধন্য লেখকের তৈরি গল্প কথা। বইয়ের কলেবর প্রমিত পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্যই এভাবে দু'জন লেখককে একই বাঁধাইয়ের ভেতরে এনেছেন প্রকাশক। বিষয়টি কিছুটা অভিনব হলেও পাঠকের জন্য মন্দ নয়।

'কিতাব কেন্দ্র' নতুন আঙ্গিকের এসব বই বের করে একদিকে যেমন ইসলামী চেতনা বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে পাশাপাশি গড়ে তুলছে বাংলা ভাষার অঙ্গনে ইসলামী সাহিত্যের এক অনাস্বাদিতপূর্ব ধারা। এ বইটির প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে আল্লাহ উভয় জাহানের কল্যাণ দান করুন। লেখক ও সম্পাদকের ভাগ্যও সকল পর্যায়ে সুপ্রসন্ন হোক। হাজার হাজার পৃষ্ঠার সুখপাঠ্য ও উপাদেয় পঠন সামগ্রী জাতিকে অব্যাহতভাবে যোগান দিতে সক্ষম হোক নতুন প্রজন্মের প্রাণপ্রিয় প্রকাশনা সংস্থা 'কিতাব কেন্দ্র'। আল্লাহ মেহেরবান!

ঢাকা
জুলাই ২০০৩

বিনীত
উবায়দুর রহমান খান নাদভী

রাত একটা।

অদূরে মাজার-ই-শরীফের প্রবেশ দ্বার। আফগান এক প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই-শরীফ। রাস্তাটি প্রশস্ত। তবে সাপ চলা পথের মত আঁকাবাঁকা। দু'ধারে উঁচু উঁচু পাহাড় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে। পশ্চিম আকাশে শুক্ল পক্ষের চাঁদ হাসছে, তার কিরণে দূরের মরুভূমিকে রহস্যময় মনে হচ্ছে।

মাসুদ পাহাড়ের পা ঘেঁষে নামছে ছায়ার মত নিঃশব্দে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। তবুও শরীর ভিজে উঠেছে ঘামে। দু'দিন গোসল করা হয়নি। গায়ের জামা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

মাসুদ নেমেই চলেছে-খুব সন্তর্পণে, সতর্কতার সাথে। মাজার শরীফে প্রবেশের সকল পথ বন্ধ। বন্ধ প্রধান সড়কে চলাচল করাও। তাই এই দুর্গম পথ বেছে নিয়েছে সে। কাঁধে গুরু দায়িত্ব। সোভিয়েত সৈন্যরা বাগলান শহর পুনর্দখল করতে চায়। এজন্য তারা খুব তোড়জোড় চালাচ্ছে। তাদের সব তোড়জোড় বানচাল করতে হবে। তাই বিশ্ব মুজাহিদ নেতারা বাংলাদেশী এই তরুণ মুজাহিদকে নির্বাচিত করেছেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাসুদ। শেষ বর্ষের পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় ছিলো। এমন সময় সোভিয়েত সৈন্যরা প্রবেশ করলো আফগানিস্তানে। অন্যদের সাথে সেও যোগ দিলো মুজাহিদ বাহিনীতে। অসম সাহসিকতা আর বীরত্বের ফলে নাম করে ফেলল অল্প দিনেই। তার পর থেকে তার কাঁধে পড়তে থাকলো বিভিন্ন অপারেশনের গুরু দায়িত্ব।

মাইমানা-মাজার সড়কে এতো রাতে গাড়ি চলার কথা নয়। তবুও চলছে। সবই সামরিক গাড়ি। কোনটি আসছে, কোনটি যাচ্ছে। সৈন্য বোঝাই কোনটিতে। কোনটিতে মালপত্র ও গোলা-বারুদ।-তাহলে সত্যিই কি ওরা বাগালান আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে?

একটু থামলো মাসুদ। জিরিয়ে নিলো কিছুক্ষণ। হাত-পায়ের শক্তি কমে আসছে যেন। বেশ কষ্ট হচ্ছে নামতে। আরো একটি গাড়ি চলে গেল রাস্তা দিয়ে। সম্ভবত অস্ত্রবাহী গাড়ি। নিঝুম রাতে গাড়ির শব্দটি অদ্ভুত শোনালো। আকাশে ক'টি নিশাচর পাখি ডানা ঝাঁপটা মারছে আর উড়ছে। মাঝে মাঝে তার স্বরে চিৎকার করছে। দূর মরু ভূমিতে তাদের সে শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রায় নেমে এসেছে মাসুদ। রাস্তা বেশি দূরে নয়। আর একটি গাড়ি আসছে পূর্ব দিক হতে। বাঁয়ে মোড় নিতেই এক ঝলক আলো এসে পড়লো মাসুদের গায়ে। দ্রুত পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো সে। গাড়িটিও দাঁড়িয়ে পড়লো জোরে ব্রেক কষে। তা হলে কি ওকে দেখে ফেলেছে ওরা? ক সেকেন্ড কেটে গেলো নীরবে। কেউ নামছে না গাড়ি থেকে। কপাল কুঞ্চিত হলো মাসুদের। সতর্ক দৃষ্টি ছুড়ে দিলো পাথরের আড়াল থেকে। তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। হালকা কুয়াশার মত মনে হচ্ছে চারদিক। একখণ্ড মেঘ এসে আকাশের ফালি চাঁদকে গ্রাস করার কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এক. দুই-তিন... মুহূর্তগুলো বয়ে যাচ্ছে। ঘামের প্রবাহও বেড়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। হৃৎপিণ্ডটিও অস্বাভাবিক রকম লাফাচ্ছে। তবে কি সে ভয় পেয়েছে? ভয় পাওয়ার মত কিছু তো ঘটেনি। ওরা দেখে ফেললেও ক্ষতি নেই। ডান হাতটি অজান্তে ট্রাউজারের পকেটে চলে যায়। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল সেখানে। বের করলো সেটি।

হঠাৎ দরজা খুলে ড্রাইভার নেমে পড়লো। পিছনে বসা দু'জন সৈন্যও নেমে পড়লো ঝটপট। হাতে মেশিনগান। দৃষ্টি তাদের পাহাড়ের দিকে। গাড়ির পিছনের চাকার হাওয়া চলে গেছে। ড্রাইভার সেটি খোলার কাজে ব্যস্ত। ওয়াকিটকি হাতে অফিসারটিও নেমে পড়লো এক সময়।

মাসুদ খুব ধীরে পা টিপে টিপে নামছে। সামনে বেশ ক'টি ঝোঁপঝাড়। গা বাঁচাতে ওগুলো যথেষ্ট সাহায্য করবে। পাহাড়ি মশা হন্যে হয়ে উঠেছে। মুখ-হাত জ্বলে যাচ্ছে তাদের তীব্র দংশনে। তবুও নিথর মাসুদ। মাজার শরীফে প্রবেশের মোক্ষম সুযোগ এটি। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। -প্রায় নেমে এসেছে সে, আর অল্প একটু বাকি। সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

ড্রাইভার নতুন চাকা লাগাচ্ছে। ওয়াকিটকিতে কথা বলছে অফিসার। মাসুদ সব বুঝতে পারছে না। তবে যতটুকু বুঝলো তাহলো–চাকার হাওয়া চলে গেছে। লাগানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এক্ষুণি রওনা হচ্ছি আমরা। ভয়ের তেমন কারণ নেই......।

মাসুদ বিড়ালের মত নিঃশব্দে আরো ক'মিটার সামনে এলো। গলা শুকিয়ে গেছে। জিহ্বা কেমন তেতো লাগছে। মশারা আরো হন্যে হয়ে উঠেছে। ড্রাইভারের চাকা লাগানো শেষ। পুরনো চাকা উপরে উঠানোর চেষ্টা করছে। অত্যন্ত ভারী। একা পারছে না। সৈন্য দু'টি তার সাহায্যে এগিয়ে এলো। এটিই মোক্ষম সুযোগ, এমন সময়ের অপেক্ষায়ই ছিলো মাসুদ। যা করার এক্ষুণি করতে হবে। দেরি করলে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

তিনটি গুলি খরচ করলো মাসুদ। কাটা কলাগাছের মত ওরা মাটিতে নেতিয়ে পড়লো। আর কালক্ষেপণ নয়। ক্ষিপ্র গতিতে বেরিয়ে এলো। ততক্ষণে অফিসারটির হাতে পিস্তল উঠে এসেছে। ওকে গুলি করার সুযোগ দিলো না মাসুদ। নিজের দেহকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে তার কান বরাবর মাপা ওজনের এক ঘুষি বসিয়ে দিলো। এমন আকস্মিক আক্রমণের জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। ঘ্যাত করে একটি শব্দ হলো। তারপর অফিসারও গোড়া কাটা গাছের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেলো।

দেরি করা ঠিক হবে না– ভাবলো মাসুদ। যে কোন মুহূর্তে অন্য গাড়ি আসতে পারে। লাশ তিনটিকে পাথরের আড়ালে সরিয়ে ফেললো। তারপর নিজের পিঠে বাঁধা ব্যাগ খুলে আফগান সরকারি বাহিনীর পোশাক পরে নিলো। অফিসারের নিথর দেহকে ড্রাইভিং আসনের পাশের সিটে কায়দা করে বেঁধে দিলো। তাকে এখন দক্ষ আফগান সৈন্য মনে হচ্ছে। কি করবে এখন–ভাবছে সে। সামনে মহা বিপদ। স্বেচ্ছায় মৃত্যু গুহায় পা দিয়েছে সে। কিন্তু মৃত্যুর মুখে তাকে পড়লে চলবে না। তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচার পথ খুঁজে বের করতে হবে।

ঃ হ্যালো, হ্যালো তাশান্দি। ওয়াকিটকিতে কথা হচ্ছে; মেজর নোভিস্কা কি বলেছেন তোমাকে? মেজর জেনারেল কিসমিওভিতা কথা বলছেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর উত্তরাঞ্চলীয় প্রধান তিনি।

বাম হাতে ওয়াকিটকি তুলে নিলো মাসুদ। ডান হাতে স্টিয়ারিং। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে।

সামান্য উত্তেজনা অথবা একটু ভুল মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ভেবে চিন্তে উত্তর দিতে হবে।

ঃ স্যার, তিনি খুবই সতর্ক থাকতে বলেছেন।

ঃ যাত্রা শুরু করেছ?

ঃ জি স্যার!

ঃ কতগুলো রাসায়নিক অস্ত্র পাঠাবে বলেছেন?

কঠিন প্রশ্ন! মাসুদ একবার পাশে বাধা অফিসারের দিকে তাকালো চোখ দু'টো ভীষণ রকম বড় হলো তার। সত্যিই, তারা বাগলান শহরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চায়। একটি মানুষকেও তারা বাঁচতে দিতে চায় না!

ঃ স্যার, সাক্ষাতেই আমাকে কথা বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঃ O.k. গেটে প্রবেশের জন্য আমি বলে রেখেছি।

ঃ জি স্যার!

প্রবেশ দ্বার আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। গাড়ির গতি কমিয়ে দিলো মাসুদ। প্রখর প্রহরা। ভারী অস্ত্র হাতে রুশ সৈন্যরা পায়চারী করছে। কিঞ্চিৎ দূরে বালুর বস্তা উঁচু করে সাজানো। তার ফাঁকে ভারী মেশিনগানের নল উঁকি দিচ্ছে। এক পাশে দশ-পনেরোটি এ.এম.এক্স. ট্রাক লাইন দিয়ে দাঁড় করানো। দশ-বারোটি এফ.সি. আর সাজোয়া গাড়িও রয়েছে পাশে। দু'জন অফিসার গোছের সৈন্য এগিয়ে এলো। গাড়ির সামনে পিছনের নম্বর দেখলো তারা। মাসুদের দৃষ্টি সামনের দিকে। বরফের মত শীতল চাহনী। মাথায় নানান চিন্তা। ধরা পড়ে যাবে না তো? এদিকে পাশে বসা অফিসারের জ্ঞান ফিরে আসতে শুরু করেছে। দু ধারে মাথা নাড়ছে আর কি যেন বিড়বিড় করছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাসুদ। দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে সে। শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না।

ঃ কোথা হতে আসা হচ্ছে?– তাশান্দির কাছে জানতে চাইলো একজন।

ঃ মা–মানা! বিড়বিড় করলো তাশান্দি। –মাসুদ তাশান্দির দিকে সরে এলো! এক হাত পকেটে। অন্য হাতে জানালা খুললো। তারপর স্পষ্ট করে বললো–'মাইমানা হতে'। –লোকটি মাসুদের দিকে ক'সেকেন্ড তাকিয়ে

রইলো। খুব তীক্ষ্ম ও গভীর সে দৃষ্টি। তারপর তাশান্দির দিকে অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি ফেলে গেট খুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলো। হালকা হলো মাসুদ। আল-হামদুলিল্লাহ বলে গাড়ি ছেড়ে দিলো। গাড়ি পাঁচ মিটার এগোতেই আবার তাকে থামার নির্দেশ দিলো লোকটি। কিন্তু মাসুদ মরিয়া তখন। সে নির্দেশে কর্ণপাত করলো না। কর্ণপাত করার অর্থ ধরা পড়া। সেটি হবে নিশ্চিত বোকামি। তার থেকে সামনে এগোনোই শ্রেয়। সে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। একটি ধাক্কা খেয়ে গাড়ি তীর বেগে ছুটে চললো। মনে তার ঝড় উঠেছে। তুমুল ঝড়। বাঁচতে তাকে হবেই। এদিকে তাশান্দির জ্ঞান ফিরে এসেছে। নড়ে বসার চেষ্টা করছে সে। পারছে না। শরীর বাঁধা রয়েছে– বুঝতে একটু সময় লাগলো তার। কিন্তু তখনো সে সব কিছু মনে করতে পারছে না। গাড়ি আস্তে চালানোর নির্দেশ দিলো, নির্দেশ মানলো না মাসুদ। গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। দু'তিনবার দ্রুত চোখের পলক পড়লো তাশান্দির। তার সব কিছু মনে পড়ছে এখন। ভীষণ রেগে গেছে সে। হুংকার ছাড়লো এবার।

ঃ আমার ওয়াকিটকি কোথায়? কে তুমি:

ঃ তোর যম।

ঃ গাড়ি থামাও বলছি।

ঃ থামাবো। তবে একটু পরে। তোকে যমদু...। অপর প্রান্তের ভয়েস ভেসে আসছে ওয়াকিটকিতে। হ্যালো... হ্যালো... তাশান্দি...। সামনে হাত বাড়ায় তাশান্দি। বাম হাতে স্টিয়ারিং ধরা মাসুদের। ডান হাতে পিস্তল তখন। চোখ দুটি জবা ফুলের মত লাল।

ঃ খবরদার! ওয়াকিটকি স্পর্শ করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

ঃ ও, হারামজাদা! কুত্তার বাচ্চা।...

ঃ চোপ, বেয়াদব! গম গম করে বেজে উঠলো মাসুদের কণ্ঠ। পরগাছার বাচ্চা পরগাছা। তোর কথা বলার সাধ আমি চিরতরে মিটিয়ে দিচ্ছি। নে তবে তোর উপযুক্ত সাজা। ট্রিগারে টিপ দিলো মাসুদ। ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। তাজা রক্ত বের হচ্ছে তাশান্দির মাথা হতে। মাসুদ মরিয়া হয়ে উঠেছে। যেভাবেই হোক, এদের হাত থেকে তাকে বাঁচতেই হবে। রক্তের গন্ধ তাকে আরো দুঃসাহসী করে তুলল। পিছনে অনেকগুলো গাড়ি। তীর

বেগে ছুটে আসছে। ছুটে আসছে ঝাঁক ঝাঁক গুলি। কমে আসছে দূরত্ব। যেকোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। এভাবে বেশিদূর এগোনো যাবে না। ওয়াকিটকিতে বার বার 'হ্যালো হ্যালো' শব্দ হচ্ছে সাড়া না পেয়ে অপর প্রান্ত রেগে যাচ্ছে। সামনে একটি মোড়। বাম হাতে দরজা খুললো মাসুদ। তারপর চলন্ত গাড়ি হতে লাফ দিলো। সোজা গিয়ে গাছে আঘাত খেয়ে উল্টে গেলো গাড়ি। তাল সামলে নিয়ে একটি গ্রেনেড ছুড়ে দিলো মাসুদ, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়ে গাড়িতে আগুন ধরে গেলো।

মাসুদ টিলা বেয়ে উপরে উঠলো। ক্লান্তিতে চোখের পাতা বুঁজে আসছে। হাত-পায়েও তেমন জোর পাচ্ছে না। একটু ঘুমাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু কি করে ঘুমাবে। চারদিকে শত্রু। তাজা বুলেট তার পিছু পিছু ছুটছে। উল্টা দিকে তাকিয়ে দেখলো, কুন্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। গাড়ির আগুন নেভানো হয়নি। সৈন্যরা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তাকে। টিলার এদিকেও ছুটে আসছে ক'জন। তাকে পালাতেই হবে।

চাঁদকে ঘিরে ক'খণ্ড মেঘ ভিড় জমিয়েছে। হালকা আঁধারে নামতে কষ্ট হচ্ছে মাসুদের। উঁচুনীচু তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ক'টি আছাড় খেয়েছে ইতিমধ্যে। ডান পায়ের পাতায় আঘাত পেয়েছে বেশি। মনে হচ্ছে একটি নখ উঠে গেছে। সুচালো পাথরে কপালের দু'এক স্থান ফেটে গেছে। নোনতা রক্ত এসে গালে পড়ছে। ঠাণ্ডা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বরফ পড়বে নাকি? থেকে থেকে বাতাসের ঝাঁপটা এসে বাড়ি মারছে গায়ে। ছোটখাটো খাদে পানি জমে আছে। টিলার মাথায় ঝলক ঝলক আলো এসে আছড়ে পড়ছে। অর্থাৎ শত্রুরা টিলার উপরেও খুঁজতে শুরু করেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে।

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত। সাড়া শব্দ নাই কোথাও। মাঝে মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা। সাথে ঝাঁপটা বাতাস। শরীরের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তারপরও ঘামে সিক্ত বসন। পা চলতে চাইছে না আর। মাসুদ হাঁটছে মাতালের মত পা ফেলে। হাত-পা টলছে। বেশ দূরে একটি বাড়ির দোতালায় আলো জ্বলছে। সে দিকেই পা বাড়ালো মাসুদ। অন্য বাসায় গেলে ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে কষ্ট হবে।

একটি শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। বোঝা যাচ্ছে না কিসের শব্দ। উৎকর্ণ হলো মাসুদ। হ্যাঁ, এবার সে বুঝতে পারছে কিসের শব্দ। মিহি কণ্ঠে কোন মহিলা পবিত্র কোরআন পাঠ করছেন। খুব দরদ দিয়ে পড়ছেন তিনি। রাতের স্তব্ধতা ছিন্ন করে সে আওয়াজ চারদিকে স্বর্গীয় জ্যোতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ পাঠে মাধুর্য আছে। আছে মোহনীয় শক্তি। মনে দোলা দেয় এ সুর। মাথা অবনত হয় খোদার সামনে। এইতো উপাসনা করার উপযুক্ত সময়।

পথ চলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে মাসুদের। পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করছে বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো গেট। কোরআন পাঠ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখন। আবেগভরে দরদমাখা কণ্ঠে পাঠ করছেন তিনি ঃ

হে ঈমানদারগণ! (শক্রর সাথে) মোকাবিলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকো। অতঃপর সুযোগ ও প্রয়োজনানুসারে পৃথক পৃথকরূপে অথবা এক সাথে বেরিয়ে পড়।

তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পশ্চাদপদ হয় না।....

যেন স্বর্গ থেকে ভেসে আসছে এ মর্মস্পর্শী বাণী। মাসুদ আর এগোতে পারছে না। শ্রবণশক্তির ওপর মনে হচ্ছে কুয়াশার মত আবরণ পড়ছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না আর। অবচেতন শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে ভাসা ভাসা শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। সে তলিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে গভীরে। মহিলা পাঠ করেই চলেছেন।

খোদার পথে লড়াই করা সেই সব লোকদের কর্তব্য, যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়।...

খোদার পথে যে নিহত বা বিজয়ী হবে; তাকে অবশ্যই আমরা প্রতিদান দিবো। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা খোদার পথে যুদ্ধ করবে না, অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা নিপীড়িত হয়ে করুণ কণ্ঠে ফরিয়াদ করছে ঃ

হে (আমাদের) প্রভু! আমাদের এই অত্যাচারী জনপদ হতে বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দাও।

ফাহিমার চোখ অশ্রুসিক্ত। চেহারায় স্বর্গীয় আভা। কোরআন পাঠ বন্ধ রেখে সে দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে। উদাস চাহনী। অথচ ঘুমের সাথে তার বৈরিতার সম্পর্ক নয়, বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সে তো ঘুমাতে চায়। ঘুমিয়ে পড়লে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়। অথচ ঘুম তাকে বরাবরই ফাঁকি দিয়েছে। মাকে হারিয়ে সে ঘুমিয়ে থাকতে চেয়েছে। পারেনি। একমাত্র ভাই জেহাদে যোগ দিলে চাচার কাছে থেকেছে। রুশ বিমান হামলায় চাচার পরিবার শেষ হয়ে গেছে। অলৌকিকভাবে সে বেঁচে গেছে। তখনও সে ঘুমিয়ে থাকতে চেয়েছে। পারেনি– আশ্রয় পেয়েছে ইয়াসিন সাহেবের এই বাড়িতে। এখানেও সে ঘুমাতে চায়। পারে না। ঘুম আসে না। বার বার শুধু একটি মুখ মনে পড়ে। সে এখন কোথায় আছে? কেমন আছে? বেঁচে আছে তো? সেকি তাকে খুঁজে পাবে? না পেয়ে কি স্বদেশে ফিরে যাবে? অন্য দেশের জন্য তার কেন লড়তে যাওয়া শত্রুর সাথে, কেন সে মুজাহিদ হলো।

চিন্তায় ছেদ পড়লো ফাহিমার। কলিং বেল-এর শব্দ হলো কি? হ্যাঁ, রাতের নীরবতা ভেঙে আবার বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং। এতো রাতে কে এলো? চোর-ডাকাত নয়তো? রুশ বা সরকারি কম্যুনিষ্ট সৈন্যরাও হতে পারে। বাড়ি তল্লাশি করতে চায় নাকি?... পারভীনকে ধাক্কা দিয়ে জাগালো ফাহিমা। পারভীন ইয়াছিন সাহেবের মেয়ে। ফাহিমার সমবয়সী। এ বাড়িতে আসার পর সেই তার নিত্য সঙ্গী।

ঃ কলিং-বেল-এর শব্দ শুনলাম।– ফাহিমা ফিস্ ফিসিয়ে জানালো পারভীনকে।

ঃ রাত ক'টা এখন?

ঃ ভাইয়া অথবা আব্বুও হতে পারেন?

ঃ কিন্তু তাদের তো আজ বাড়ি ফেরার কথা নয়। তাছাড়া শহরে তো রাতভর কারফিউ।

ঃ তুই ঠিক শুনেছিস?

ঃ হ্যাঁ, দু'বার বাজল।

ঃ সরকারি সৈন্যরা বাড়ি তল্লাশি করতে এলো না তো?

ঃ কিন্তু এতো রাতে?

ঃ চল আম্মুকে ডাকা যাক।

ঃ তাকে আর ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দেওয়া কেনো। তার চেয়ে চল নিজেরাই গিয়ে দেখি।

ঃ না বাবা; অতো সাহস আমার সেই। তোর সাহস আছে, তুই যা।

ঃ বিপদে পড়েও তো কেউ আসতে পারে?

ঃ তাই বলে এতো রাতে?

ঃ বিপদের কি রাত-দিন আছে? তোদের বাড়িতে কোন সময় এসেছিলাম, মনে আছে?

পারভীন আর কথা বাড়ায় না। গায়ে শাল জড়িয়ে দু'জন এক সাথে নীচে নেমে আসে। বাইরের লাইট অন করে আই হোলে নজর রাখে পারভীন।

ঃ কিছু দেখা যাচ্ছে?

ঃ কি যেন একটা পড়ে আছে?

নড়াচড়া করছে না। মানুষ হয়তো! ওকে সরিয়ে ফাহিমা চোখ রাখে আই হোলে। মানুষই তো। পোশাক দেখে তাই মনে হচ্ছে। আফগান সৈন্য হয় তো। পোশাক দেখে তাই মনে হচ্ছে। কাদা-মাটির ছাপ পোশাকে। দরজা খুলে ফাহিমা। চমকে উঠে পিছিয়ে আসে। রক্তাক্ত এক যুবক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। চারদিকে দৃষ্টি ফেরালো একবার। কেউ কোথাও নেই। কিছু একটা করা দরকার। শরীরের পোশাক ভেজা মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডায় হয় তো রক্ত জমে গেছে। দু'জনে ধরাধরি করে যুবককে ভেতরে নিয়ে এলো ওরা।

মাসুদের জ্ঞান ফিরে এসেছে। মোটা কম্বলে সমস্ত শরীর ঢাকা। তার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে– এই আলো ঝলমল ঘরে সে কি করে এলো। যতদূর মনে পড়েছে, একটি বাড়ির কলিং বেলে হাত রেখেছিলো সে। তবে কি এটিই সেই বাড়ি? সমস্ত শরীরে ব্যথা। নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। ক্ষতস্থানগুলোই যন্ত্রণা হচ্ছে। একবার দৃষ্টি ফেরালো ডান দিকে। চেয়ারে বসা এক মধ্য বয়সী মহিলা। দৃষ্টি তার দিকে। স্নেহভরা মিষ্টি চাহনী। ঠোঁটে কৃতজ্ঞতার হাসি। মনে হচ্ছে কোন উৎকণ্ঠা হতে তিনি এইমাত্র মুক্ত হলেন।

ঃ তোমার কষ্ট হচ্ছে বাবা?

মাসুদ নিরুত্তর। মহিলার দিকেই চেয়ে আছে সে। কে এই মহিলা? এতো স্নেহ কেন তার চাহনীতে। পৃথিবীর সব মা-ই কি এক রকম? এতো সুন্দর?

ঃ আমার কথা বুঝতে পারছো তুমি?

এবারও নিরুত্তর মাসুদ। কোথায় সে এখন...

ঃ কষ্ট হচ্ছে তোমার?

নাসূচক মাথা নাড়লো মাসুদ। পরিস্থিতি ভালো করে বুঝে উঠার চেষ্টা করছে সে। ভাবছে, এখন কি করণীয় তার।

ঃ দুধ রেখে দিলাম টেবিলে। তুমি বিশ্রাম কর। আমরা পাশের রুমে আছি।

ঃ তা আর দরকার হবে না মা। ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

ফাহিমা একবার তাকালো যুবকটির দিকে। মুখে লেগে থাকা কাদা-মাটি শুকিয়ে গেছে। তার সাথে রক্ত মিশে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ঠিক বাচ্চাদের বই-এর ভূতের ছবির মত। ওর হাসি পেলো, কিন্তু হাসতে পারলো না। নির্লজ্জের মত তার দিকে চেয়ে আছে ছেলেটি। গা জ্বলে উঠলো ফাহিমার। অসভ্য কোথাকার! যারা তোর প্রাণ দান করলো তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নেই। আর একবার ঘৃণাভরা দৃষ্টি ফেলে সে কক্ষান্তর হলো।

মাসুদ তবুও চেয়ে আছে। পলকহীন উদাস চাহনী। মেয়েটি যে কক্ষান্তর হয়েছে, মনে হচ্ছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। কাকে দেখলো সে? সে জেগে আছে তো? হ্যাঁ, জেগেই তো। এ স্বপ্ন হয় কি করে? স্বচক্ষে যেমন দেখলো তাকে, স্বকর্ণেও তো শুনলো তার কথা। তাহলে...

ঃ দুধটা খেয়ে নাও বাবা।

এবারও কথা বললো না মাসুদ। উঠে বসার চেষ্টা করলো। পারলো না, ভীষণ ব্যথা সমস্ত শরীরে। যন্ত্রণা হচ্ছে ক্ষতস্থানে। মহিলা তাকে সাহায্য করলেন।

ঃ বেশ আঘাত পেয়েছো দেখছি। রক্ত পড়ছে কপাল হতে। ক্ষতটাও বড় মনে হচ্ছে।

ঃ না তেমন না। তুলা হবে একটু? -প্রথম কথা বললো মাসুদ। মহিলা কিছু তুলা ও একটি মলম বের করে তার সামনে রাখলেন, রক্ত পরিষ্কার করে মাসুদ নিজেই মলম লাগালো।

ঃ ওখানে কি গুলি লেগেছে? একটু আগে গোলাগুলির শব্দ শুনেছিলাম। উত্তরের আশায় ক'সেকেণ্ড দেরি করলেন মহিলা। কিন্তু নিরুত্তর মাসুদ। তাই প্রসঙ্গ পাল্টালেন তিনি-

ঃ তোমার মনে হয় ক্ষুধা পেয়েছে?

ঃ জি! সরাসরি উত্তর মাসুদের।

কিছু বিস্কুট, এক ডালি ফলমূল ও ফ্লাস্কে কফি এনে বসলেন মহিলা। মাসুদ খাওয়া শুরু করলো। মহিলা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যুবকটিকে বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি।

ঃ কোন পুরুষ নেই বাড়িতে?

মহিলা ক'সেকেণ্ড ভাবলেন। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? কোন দূরভিসন্ধি নেই তো?

ঃ এ মুহূর্তে নেই!

ঃ বাইরে থাকেন সবাই?

ঃ না!

ঃ চাকরি করেন?

ঃ আমার ছেলে মাজার কলেজের লেকচারার।

ঃ কতদিন হলো তিনি শিক্ষকতা করছেন?

ঃ তুমি কিন্তু খাচ্ছো না।–মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন মহিলা। ছেলেটি কোথায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ধন্যবাদ দিবে, তা না হাঁড়ির খবর নিতে শুরু করেছে। বোধহয় কৌশলে জেনে নিতে চায়, এ বাড়ির কেউ মুজাহিদ কিনা।

ঃ আজ ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ছে।

ঃ হ্যাঁ, ঠাণ্ডায় তো তুমি জমে গিয়েছিলে প্রায়।

ঃ বড় ঝামেলায় পড়েছিলাম। লাখ লাখ শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে।

ঃ বেশ ছিলো এদিকটায়। কিন্তু সম্প্রতি মুজাহিদরা এখানেও আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে।

ঃ সেটি কি তাদের অন্যায়?

মহিলা সতর্ক হলেন, কি বলছে এই আফগান সরকারি সৈন্য। কি তার মনের ইচ্ছা। হাঙ্গামা করবে না তো? না স্বপক্ষ ত্যাগ করেছে? ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হবে। সাধারণ সৈন্য হলেও জ্ঞানী মনে হচ্ছে।

ঃ রাজনীতি করলে এর একটা যুৎসই উত্তর দেয়া যেত।

ঃ অবস্থার পরিপেক্ষিতে সত্য গোপন করা অন্যায় নয়। আর যা সত্য তা স্বীকার করাও দোষের নয়।

ঃ বুঝলাম না বাবা।

ঃ বিদুষী আপনি। বয়সেও আমার অনেক বড়, মায়ের মত। এই সহজ সত্যটা বোঝেননি, সেটাও বিশ্বাস করতে হবে?

মহিলা এবার নিরুত্তর রইলেন। কথা ঘুরিয়ে অন্যদিকে মোড় নিতে পারতেন, কিন্তু নিলেন না। স্বদেশবিরোধী এই আফগান সৈনিকের প্রতি তার মনে কিঞ্চিৎ ঘৃণা দানা বাঁধলো।

ঃ তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?

ঃ অনেক দূরে।

ঃ সঠিক উত্তর হলো না।

ঃ কেন বলুন তো?

ঃ না, এমনি তবে তোমার কথা বলার ধরনটি একটু অন্যরকম। মনে হচ্ছে–

ঃ যুদ্ধের ওই দৃশ্যটি অপূর্ব।

ঃ ওটি আমার মেয়ে টাঙিয়ে রেখেছে। মুখটা একটু কঠিন হলো তাঁর। –ও একটু বেপরোয়া। কথা শুনতে চায় না।

ঃ আপনার মেয়ে–অর্থাৎ যিনি দুধ রেখে গেলেন?

মহিলার দৃষ্টি প্রখর হলো। মাসুদের দিকে তাকালেন তিনি। মাসুদ ছবি দেখছে। মহিলার এ দৃষ্টি দেখলে নিঃসন্দেহে সে ঘাবড়ে যেত। স্নেহভরা কোন মায়ের দৃষ্টি ও মুখ যে এতো কঠিন হতে পারে, তা ভাবতেও কষ্ট হতো তার। তিনি একটু শক্তভাবে বললেন।

ঃ হ্যাঁ, তুমি বরং বিশ্রাম করো। শরীরে জোর পাবে।

মহিলা চলে গেলেন। মাসুদ বসে রইলো। ভোর হতে অনেক দেরি। একটা ঘুম দিলে মন্দ হয় না। গ্লাসের অবশিষ্ট কফিতে চুমুক দিয়ে শুয়ে পড়লো সে।

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলো মাসুদের। পূর্ব আকাশ সাদা হয়ে উঠেছে। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। ক্লান্তি কেটে গেছে। অজু সেরে নামাজ পড়লো সে। এবার তাকে উঠতে হবে। কিন্তু বাড়ির কেউ জেগেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এরা কেউ নামাজ পড়ে না নাকি? অগত্যা মাসুদ কোরান তেলাওয়াত শুরু করলো। ওর গলাটি সুন্দর। গম্ভীর এবং ভারী। গম গম করে বাজে।

ঃ ফাহিমা!– লোকটি কোরান পাঠ করছে। শুনবি আয়। গলাটি সুন্দর। পারভীন ফাহিমাকে ডাক দেয়।

ঃ চোরের মুখে আল্লাহ নাম। কাজ নেই শুনে।

ঃ তোর অন্যায় এটি। মানুষের বাহ্যিকটাই সব?

ঃ সোভিয়েত কমিউনিষ্টদের দোসর সে।

ঃ অবস্থা তাকে বাধ্য করেছে হয়তো। হতে পারে–

ঃ পারে তো অনেক কিছু। তবে এক্ষেত্রে সম্ভাবনা কম। খালাম্মা বলেননি–তার কথাবার্তা মুজাহিদবিরোধী।

ঃ কিন্তু;

ঃ আপদ গেলে বাঁচি। ঘুমটাই কি মাটি হলো আজ।

ঃ আস্তে বল। উনি শুনতে পাবেন।

ঃ তার শুনাই উচিত।

ঃ অথচ রাতে তুই তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিস।

ঃ মানবিক দায়িত্ব ছিলো সেটি।

পারভীন আর কথা বাড়ায় না। সরকারি সৈন্যদের ওপর তারও রাগ কম নয়। কিন্তু সব সৈন্যই কি মুজাহিদবিরোধী। প্রায়-ই-তো শোনা যাচ্ছে, দল ত্যাগ করে তারা মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে।

মহিলা এ ঘরে এলেন অনেক পরে। মুখে জ্যোতির্ময় আভা ছড়ানো। তবে চোখ দু'টি কিঞ্চিৎ লাল। সামান্য ফোলা ফোলাও মনে হচ্ছে। হয়তো কান্নাকাটি করেছেন। নচেৎ ভালো ঘুম হয়নি। মহিলার হাতে তসবীহ।

ঃ ভালো ঘুম হলো বাবা?

ঃ জি!

ঃ এখন কি করবে?

ঃ চলে যেতে চাই, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আপনাদের ছোট করবো না। আ-জীবন মনে রাখবো এ ঋণের কথা। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিবেন।

ঃ তোমার পোশাকগুলো শুকিয়ে রাখা হয়েছে।

ঃ কিন্তু; ওগুলো আর পরতে চাই না।

ঃ পরতে চাও না।

ঃ অনুগ্রহ করে যদি কিছু অন্য পোশাকের...

কপাল কুঞ্চিত হলো মহিলার। একজন সৈন্য তার ইউনিফর্ম পরতে চায় না-আশ্চর্য বৈকি! এটা কি তার হেঁয়ালী না কোন দুরভিসন্ধি?

ঃ তুমি আমার ছেলের বয়সী। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

ঃ করুন।

ঃ সত্য বলবে?

ঃ মিথ্যাকে আমি ঘৃণা করি।

ঃ সেনাবাহিনী হতে তুমি ভেগে এসেছো?

ঃ না।

মহিলা এবার সরাসরি মাসুদের চোখের দিকে তাকালেন। খুবই গভীর এবং অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি। তিনি হয়তো দেখে নিলেন, সে সত্য বলছে কিনা! মাসুদ দৃষ্টি অবনত করলো।

ঃ এক্ষুণি চলে যাবে?

ঃ যদি পোশাকের ব্যবস্থা করে দেন।

ঃ একটু অপেক্ষা করো। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।

চলে গেলেন মহিলা। মাসুদ পূর্ব দিকের জানালা খুলে দিলো। সূর্য উঠে গেছে আকাশে। গাছের পাতায় সোনালী রোদ লুটোপুটি খেলছে।

টেবিলে ক'টি বই পড়ে আছে। একটি টেনে নিলো মাসুদ। কবিতার বই। কভার উল্টাতেই উৎসর্গকৃত লেখা নজরে এল। ফাহিমাকে–পারভীন।

বই এর প্রথম কবিতা “স্বাধীনতা। আগাগোড়া পড়লো মাসুদ। বুঝলো না তেমন, মন তার অন্যত্র। কে এই ফাহিমা? রাতে দেখা ও মুখটি কার? এ তো সে-ই মুখেরই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু সে তো মহিলার কন্যা। পদশব্দে চিন্তা টুটে গেলো মাসুদের। বই রেখে ঘুরে দাঁড়ালো।

ঃ দেখো বাবা। এগুলো তোমার গায়ে লাগে কিনা? কফি বসানো হয়েছে। নাশতা করে যাবে–শার্ট-প্যান্ট ও একটি গরম সুয়েটার টেবিলে রাখলেন মহিলা।

নাশতা সেরে কফি খাচ্ছে মাসুদ। মহিলা চেয়ে আছেন তার দিকে। স্নেহভরা আঁখি। সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন এক যুবক। চোখ দু'টো বড় বড়। জোড়া ভ্রূ। উন্নত নাক। সুপ্রশস্ত কপাল। বলিষ্ঠ বাহু। গায়ের রং সাদা। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ-আর যাই হোক এছেলে খারাপ হতে পারে না। তবে কথাবার্তা কেমন খাপছাড়া। অথচ অভদ্র নয়। নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান। ভদ্র ঘরের সন্তান।

ঃ তোমার পিতা-মাতা আছেন?

ঃ ছ'মাস আগের খবর জানি। তাঁরা ভালো ছিলেন।

ঃ কতদিন হলে বাড়ি যাওনি?

ঃ অনে-ক দিন। পোশাকগুলো কি আপনার ছেলের?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ কি বলবেন তাকে?

ঃ ব্যবস্থা করে নিবো।

ঃ সময়মত এগুলো অবশ্যই ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

ঃ তার দরকার হবে না।

উঠে দাঁড়ায় মাসুদ। বের হবার জন্য প্রস্তুত সে। অনুমতির অপেক্ষা মাত্র।

ঃ একটা সত্যি কথা বলবে বাবা?

ঃ আগেই বলেছি, মিথ্যা আমি বলি না।

ঃ তুমি তো একজন সাধারণ সৈন্য। পড়ালেখা করেছ কতদূর?

ঃ আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।

ঃ কিন্তু অন্য একটা সত্য তুমি গোপন করেছ!

ঃ আমি আসি এবার।

ঃ চলো পথ দেখিয়ে দি!

ঘর হতে বেরিয়ে একটি করিডোর হয়ে ওরা বের হবার গেটে এলো।

ঃ দোয়া করবেন-যেন ভালো থাকি! আপনাদের এ ঋণ আপনার মাতৃস্নেহ ভুলবো না কোনদিন। কথা দিচ্ছি-উপকার ছাড়া অনিষ্ট হবে না আমার থেকে। –পা বাড়ালো মাসুদ। মহিলা পিছু ডাকলেন। বড় মিষ্টি সে ডাক। ফিরে দাঁড়ালো মাসুদ।

ঃ কিছু বলবেন?

ঃ তোমার নামটি জানা হয়নি।

ঃ মাসুদুর রহমান।

ঃ বিদেশী তুমি?

ঃ আল্লাহ হাফেজ। তিনি সকলকে মঙ্গল দান করুন। হন্ হন্ করে চলে যায় মাসুদ। মহিলা তার চলে যাওয়ার পানে চেয়ে থাকেন। চোখে একরাশ বিস্ময়। কেন এবং কিভাবে এসেছিলো ছেলেটি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মাসুদ। ছাদের উপর হতে দু'টি মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে আসছে।

ঃ লোকটি চলে যাচ্ছে দেখ!– পারভীনের কণ্ঠ

ঃ যাচ্ছে যাক। আপদ গেলেই ভালো। স্বদেশবিরোধী। খাদ্দার। ঘেন্নায় মরি।

আর দাঁড়ায় না মাসুদ। দ্রুত পা ফেলে রাস্তায় ওঠে।

আইয়াজ সাহেব ঠিক সময়ে এসে মাসুদের সাথে দেখা করেছেন। তিনি খুবই বুদ্ধিমান এবং চালাক। এমন একজন মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা যায়। মুজাহিদরা যোগ্য লোকই নির্বাচন করেছে বলতে হবে। ইতিমধ্যে অনেক তথ্যও তিনি দিয়ে গেছেন মাসুদকে। বাগলান পুনর্দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কর্ণেল আমীন ও ফিলাতনকে যৌথভাবে। তারা আজ রাতের কোন এক সময় মিটিং-এ বসবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণও উপস্থিত থাকবেন। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য মিটিংটি সামরিক এলাকাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। সম্প্রতি কিছু অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের স্বপক্ষ ত্যাগ করার কারণে এই ব্যবস্থা। যতদূর জানা গেছে–মিটিং মাজারের গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

মাসুদ শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিলো-কিভাবে কি করা যায়। হোটেল পাভেলের ২০৫ নং রুমে অবস্থান করছে সে। মাজার শরীফের একমাত্র অভিজাত হোটেল। কপালের ক্ষতে যন্ত্রণা হচ্ছে। ঘুমাতে পারলে ভালো হতো একটু। কিন্তু এরূপ যন্ত্রণায় ঘুম আসবে না। উঠবে উঠবে ভাবছিলো। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

ঃ হ্যালো। দুশ পাঁচ? ম্যানেজার বলছি।

ঃ জি!

ঃ সরি মাসুদ সাহেব, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে চাই।

ঃ বলুন।

ঃ দু'এক মিনিটের জন্য বাইরে গেলেও অনুগ্রহ করে চাবিটা কাউন্টারে জমা রেখে যাবেন।

ঃ দুঃখিত! আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

ঃ আর একটি কথা!

ঃ বলুন।

ঃ আপনার পরিচয় পত্রটি প্রয়োজন!

ঃ ওটি দেখিয়েই তো হোটেলে উঠেছি।

ঃ দুঃখিত। হোটেল ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত আইডি অথবা পাসপোর্ট জমা রাখার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ঃ আই, সি! নিয়মটি কি আজ থেকে?

ঃ জি!

ঃ ও কে।

হাল ছাড়েনি তাহলে-ভাবছে মাসুদ! কি করে ছাড়বে। ক্ষতিটা তো কম হয়নি। একজন অফিসারসহ তিনজন সৈন্য মারা গেছে ওদের। গোপন তথ্যও ফাঁস হয়ে গেছে। তাই হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। ওরা ঘুরেই মরবে। খুঁজে তাকে পাবে না। মাসুদের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। দরজায় নক হলো হঠাৎ। ভেতরে আসার অনুমতি দিলো মাসুদ। এক কিশোর প্রবেশ করলো রুমে। সুঠাম দেহ। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সন্ধ্যা তারার মত জ্বলছে যেন।

ঃ আইডি কার্ড চাই স্যার।-কথা শেষ করে ছেলেটি একটি খাম মাসুদের সামনে ধরলো। ছেলেটির দিকে তাকালো মাসুদ। চোখে বিস্ময় তার। সাদিক মাহমুদ। ও এখানে কিভাবে?

ঃ মাসুদ ভাই আপনি?

ঃ কিন্তু তুই?

ঃ এ হোটেলে কাজ করি। এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে আমাকে। এখানে সব কিছু লেখা আছে। আপনার আইডি কার্ডটি দিয়ে দিন।

ঃ কিন্তু সাদিক! অন্যরা কোথায়?

ঃ চাচা বিমান হামলায় মারা গেছেন। ফাহিমা আপার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অনেকে বলে থাকেন, রুশ সৈন্যরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করি না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি আপাকে। এখনো খুঁজছি। কিন্তু কোন সন্ধান মিলছে না।

ঃ তাহলে সে কি বেঁচে নেই?

ঃ সেটি তো আল্লাহই ভালো জানেন। আইয়াজ সাহেব খুব সতর্ক থাকতে বলেছেন আপনাকে। আমার পক্ষে আর দাঁড়ানো সম্ভব নয়। হোটেলের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। আমি ছাড়াও আরো দু'জন লোক রয়েছে হোটেলে। তারাও সর্বদা সাহায্য করবে আপনাকে। পরে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।

কার্ড নিয়ে চলে যায় সাদিক মাহমুদ। মাসুদের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। তাহলে ফাহিমা কি বেঁচে নেই? রুশ নেকড়েগুলো কি ওর-! না, তা হয় না। হতে পারে না। ফাহিমা তো তারই। ক'দিন পরেই তো তার ঘরে আসার কথা ছিলো। কিন্তু রুশ বাহিনী সব ওলট-পালট করে দিলো। সত্যই কি ফাহিমা বেঁচে নেই? কিন্তু রাতে সে কাকে দেখলো ও বাড়িতে? ফাহিমার মুখেরই প্রতিচ্ছবি তো! কিন্তু সেতো মহিলার কন্যা! ফাহিমা নয়! কিন্তু তবুও-ও বাড়িতে সে যাবে। সিদ্ধান্ত নেয় মাসুদ। নিশ্চয় ফাহিমার কোন খবর মিলবে ওখানে। নচেৎ ফাহিমার ভায়ের ছবি ডাইরীর ভেতর এলো কি করে। চিন্তা ঝেড়ে ফেলে খাম খুলতে শুরু করে মাসুদ।

জহির শাহ্ ষ্ট্রিট। শহরের প্রধান সড়ক। তার ধারে একটি তিনতলা বাড়ি। মূলত এটিই স্থানীয় গোয়েন্দা অফিস। তবে বাইরে থেকে বোঝার

উপায় নেই। নীচতলায় সুপার মার্কেট। উপরের তলা দু'টিতে একটি প্রাইভেট কোম্পানীর অফিস। বাড়িটির পিছন দিকটা অনেক জায়গা নিয়ে উঁচু প্রাচীর ঘেরা।–এ বাড়ির একটি রুমে নিবিষ্ট মনে বসে ভাবছেন মিঃ দাভিস্কা। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কে.জি.বি প্রধান তিনি। কপালে চিন্তার রেখা। বারো ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, অথচ এখনো গত রাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কোন ক্লু খুঁজে বের করতে পারেনি গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যে উপরওয়ালা দু'বার খোঁজ নিয়েছেন। আগামী চার ঘন্টার মধ্যে কোন হদিস বের করতে না পারলে স্বয়ং বড়কর্তা নিজে এসে তদন্ত করবেন। তাই যদি হয়, তবে সেটি তার চাকরি জীবনের জন্য হবে একটি কলংক। কিন্তু কি করতে পারে সে! সমস্ত শহর তার লোকেরা ছেয়ে ফেলেছে। দুজন সন্দেহভাজনকে ইতোমধ্যে ধরে আনা হয়েছে। কিন্তু কোন তথ্য বের করা যায়নি। মুসলমান জাতি এক আজব চীজ। ওরা প্রাণ দিবে তবুও আদর্শ দিবে না। ছেলে দু'টিকে এ পর্যন্ত কম নির্যাতন করা হয়নি।

.....চিন্তার তার ছিঁড়ে যায় জেনারেল দাভিস্কার। ক্রিং ক্রিং টেলিফোন বেজে ওঠে। রিসিভার টেনে নেয় দাভিস্কা। হ্যালো, দাভিস্কা বলছি। জি-জি স্যার। –স্বয়ং বড়কর্তা আফগানিস্তানের কে.জি.বি প্রধান মিঃ আন্দ্রিভিস্কোর টেলিফোন।

ঃ কোন কিছুর হদিস পেলে?

ঃ পেয়ে যাবো স্যার!

ঃ অর্থাৎ এখনো পাওনি। নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছ নাকি!

ঃ স্যার! দুজনকে পাকড়াও করা হযেছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

ঃ আগামী দু'ঘণ্টার মধ্যে আমি মাজার আসছি। এর মধ্যে সব ঠিকঠাক চাই!

ঃ জ্বি স্যার!

রিসিভার নামিয়ে রাখলো দাভিস্কা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। ওপরওয়ালা রেগে গেছে ভীষণ। কিভাবে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না দাভিস্কা। মেজর তাশান্দির গাড়িতে কে ছিলো রাতে? কৌশলে এক্সিডেন্ট ঘটিয়ে সে পালালোই বা কোথায়? কর্পূর হয়ে উবে গেলো নাকি?

কলিং বেল-এ টিপ দিলো দাভিস্কা। দু'জন গার্ড ছুটে এলো হন্তদন্ত হয়ে।

ঃ বন্দি দু'জন কোথায়?

ঃ শাস্তি ঘরে স্যার।

ঃ যাও। তাদের সাথে কথা বলবো আমি। দাভিস্কা শাস্তি ঘরে এলো। ঘরটি বিল্ডিং-এর মধ্যখানে মাটির নীচে। দু'জন যুবক ফ্লোরে পড়ে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে একটু আগেই তাদের ওপর দিয়ে চলে গেছে শাস্তির ঝড়। উঠিয়ে বসানো হলো তাদেরকে। শরীরে কাবুলী পোশাক, তাতে থোকা থোকা রক্তের ছোপ।

ঃ তোমাদের সামনে এখন দু'টি পথ খোলা। মৃত্যু নয় জীবন, কঠোর কণ্ঠ দাভিস্কার। চোখ দু'টি জবা ফুলের ন্যায় লাল। হিংস্র দেখাচ্ছে তাকে।–বল, কোনটি চাও তোমরা? বল কে ছিলো রাতে মেজর তাশান্দির গাড়িতে? নিরুত্তর যুবকদ্বয়। বল কে ছিলো গাড়িতে? হুংকার ছাড়লো দাভিস্কা। বাঘের মত ফুঁসছে সে।

ঃ আগেই বলেছি, আমরা কিছুই জানি না।–বয়স্ক যুবকটি মুখ খুলল।

ঃ মিথ্যা কথা! তোমরা সব জানো।

ঃ তোমাদের লোক আমাদের শুধু শুধু ধরে এনেছে।

ঃ শুধু শুধু ধরে এনেছে। বেশ, তবে দেখ মজা।–দাভিস্কা মোটা একটি কাঠি হাতে নিলো। তারপর ছেলেটির ডান হাতের দু'আঙ্গুলের মধ্যে রাখলো সেটি। এবার কৌশলে জোরে একটি চাপ দিলো। কট করে শব্দ হলো একটি। ছেলেটি আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। দু'টি আঙ্গুলই ভেঙ্গে গেছে তার। যন্ত্রণায় মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। কুটিল হাসি দাভিস্কার ঠোঁটে।

ঃ তা হলে এখনো বলবে না কে ছিলো গাড়িতে? হেঃ হেঃ হেঃ খুব সহজে মারা হবে না! মুজাহিদ হয়েছো দু'দিনের ট্রেনিং নিয়ে। রাশিয়ার সৈন্য তাড়াবে। এর পর দাভিস্কা এক সাথে দু'টি সিগারেট ধরালো। সিগারেট দু'টি আলতো করে দু ঠোঁটের মাঝে রেখে জোরে টান দিলো। গাল ভরা ধোঁয়া ছেলে দু'টির মুখে নিক্ষেপ করে জ্বলন্ত সিগারেট ওদের গায়ে চেপে ধরলো। ওরা যন্ত্রণায় চিৎকার ছাড়লো। আবার কুটিল হাসি ফুটে উঠলো দাভিস্কার ঠোঁটে। তারপর গার্ড দু'জনকে লক্ষ্য করে বললো- এভাবে আধা ঘণ্টা জ্বলন্ত

সিগারেট এদের গায়ে চেপে ধরবে। এর মাঝে মুখ না খুললে চাবুক মারতে শুরু করবে।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত এভাবে পিটাতে থাকবে! খানাপানি বন্ধ রাখবে।

ঃ জ্বি স্যার।

রাগে গর গর করতে করতে দাভিস্কা কক্ষান্তর হলো।

পি পি করে পেজারে সংকেত দিচ্ছে। মাসুদ পকেট থেকে বের করে হাতে ধরলো মেশিনটি। কে তাকে এখন স্মরণ করতে পারে? আইয়াজ সাহেব নয়তো? না কাবুল থেকে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান? না, তিনি নন। আইয়াজ সাহেবের টেলিফোন নম্বর দু'বার জ্বলে-নিভে মেশিনের ছোট স্ক্রিন হতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। অর্থাৎ তার সাথে খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করতে হবে।

ঘড়িতে পাঁচটা দশ বাজে এখন। সূর্য ডোবার এখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি। শহরটা ভালো করে ঘোরা হলো না এখনো। লক্কর মার্কা নিশান গাড়িটি চালিয়ে আরাম পাচ্ছে না মাসুদ! আইওয়াজ সাহেব এর থেকে ভালো গাড়ি জোগাড় করতে পারেননি।

জহির শাহ্ স্ট্রিটে এসে গতি কমিয়ে দিলো মাসুদ। চোখ-কান খোলা রাখলো চতুর্দিকে। রিয়ার ভিউ মিররে একবার নজর বুলালো। না, কেউ অনুসরণ করছে না! সামনে, ডানেই তিনতালা সাদা বাড়ি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়িটির আগাগোড়া দেখে নিলো একবার। দোতালার ব্যালকনিতে তিনজন লোক বসা। তিনজনই রাশিয়ান।

সুপার মার্কেটের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালো মাসুদ। ধীর পায়ে নেমে দাঁড়ালো। উপর দিকে নজর দিতেই একজনের সাথে চোখাচোখি হলো। মধ্যম বয়সী সুঠাম দেহের অধিকারী লোকটি। চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। গভীরভাবে তিনি কিছু ভাবছেন মনে হয়।

মাসুদ ভেতরে প্রবেশ করলো। মার্কেটটি খুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে দেখলো একবার। প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আবার বেরিয়ে এলো। ব্যালকনিতে এখন কোন লোক নেই। গাড়ি স্টার্ট করে বাড়িটির পিছন দিকের রাস্তা ধরে সামনে অগ্রসর হলো!

ঃ হ্যালো! মিঃ আইয়াজ বলছি!

ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম! মাসুদ বলছি।

ঃ অ আলাইকুমুস্‌সালাম। তিন মিনিট দেরি করেছেন যোগাযোগ করতে। সংকেত পাওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনার যোগাযোগ করার কথা।

ঃ আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

ঃ শুনুন! এক্ষুণি আপনি হোটেল ছেড়ে দিবেন। কোথায় উঠতে হবে সাদিক মাহমুদ বিস্তারিত জানাবে আপনাকে। আপনার কথামতই তিনজন লোক রাখা হয়েছে। এরা পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আফগান বাহিনীর সদস্য ছিলো পূর্বে। তিনজনই আপনার পরিচিত। আপনার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হওয়াতে তারা আনন্দিত।

ঃ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

ঃ আর একটি দুঃসংবাদ শুনুন।

ঃ দুঃসংবাদ?

ঃ হ্যাঁ! আমাদের দু'জন সদস্যের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত তাদেরকে বন্দি করা হয়েছে। গতকাল রাতের রহস্য খুঁজতে ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমার ধারণা, ওদেরকে গোয়েন্দা অফিসেই রাখা হয়েছে। তাদের মুখ থেকে কথা বের করার চেষ্টা চলছে।

ঃ যে দু'জন ধরা পড়েছে–আমার ব্যাপারটি তাদের জানা আছে?

ঃ না!

ঃ আপনার সাথে আমার কি আর দেখা হবে?

ঃ না হওয়াটিই ভালো। হলে উভয়ের জন্য ক্ষতি। আমি একজন নিরীহ ডাক্তার! রোগী আর হাসপাতাল নিয়েই থাকতে দিন আমাকে। শেষের দিকে হালকা হাসলেন আইয়াজ সাহেব!

ঃO.K বস! আল্লাহ হাফেজ।–খুবই ছোট্ট পকেট–ওয়ারলেসটির সংযোগ ছিন্ন করে হোটেলের দিকে গাড়ি ছাড়লো মাসুদ।

সূর্য ডুবে গেছে একটু আগে। মসজিদের মিনারে আজান হচ্ছে। সাদিক মাহমুদের মুখে উদ্বেগ ও ভয়ের ছাপ। মাসুদের জন্য অপেক্ষা করছে সে।

গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা হন্যে হয়ে উঠেছে। হোটেলে এসেও তারা দু'একবার খোঁজ নিয়ে গেছে। সম্ভবত মাসুদ ভাই-এর ওপর তাদের সন্দেহ হয়েছে–ভাবতে থাকে সাদিক মাহমুদ। কিন্তু তিনি এতো দেরি করছেন কেনো? হোটেলে ফেরার সময়তো আধা ঘণ্টা আগেই পার হয়ে গেছে। তবে কি কোন বিপদ হলো?

মাসুদ ফিরলো আরো কিছু পরে। কাউন্টার থেকে চাবী নিলো। হাতে শপিং ব্যাগ।

ঃ আপনার খোঁজে দু'জন লোক এসেছিলো। ম্যানেজার শান্তভাবে বললেন কথাগুলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার।

ঃ কিছু বলে গেছে?

ঃ না। তবে মনে হয় লোক দু'টি.....

ঃ আবার এলে বলবেন, আমি চলে গেছি।

ঃ আপনি এখন চলে যাবেন?

ঃ জ্বি! আপনি বিল করুন। একটু পরেই নেমে আসবো আমি!

মাসুদ রুমে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো। কেমন একটা গন্ধ রুমে। জিনিসপত্রও কিঞ্চিৎ এলোমেলো মনে হচ্ছে। তা হলে কি রুমে কেউ এসেছিলো? কোথাও আড়ি পাতা যন্ত্র রেখে যায়নি তো? নিজের ব্যাগটি একবার ভালো করে চেক করলো। নতুন কাপড়গুলো ব্যাগে ভরে বাথরুম সেরে এলো। নক হলো দরজায়। কে এলো আবার? শত্রু নয় তো? প্যান্টের পকেটে একবার হাত বুলিয়ে নিলো। তারপর ধীর পায়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। সাদিক মাহমুদ সালাম দিলো আস্তে করে। চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ।

ঃ মাসুদ ভাই, আপনাকে এক্ষুণি হোটেল ছাড়তে হবে। শত্রুরা দু'বার এসে হোটেলে হানা দিয়েছে। আপনাকেই তাদের সন্দেহ ।

আমার সাথে তুইও থাকছিস?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ ছুটি নিয়েছি এক সপ্তাহের।

ঃ তুই গিয়ে গাড়িতে বোস। আমি আসছি!–চাবী বের করে দিলো মাসুদ!

হোটেল ছেড়ে কিছুদূর অগ্রসর হতেই মাসুদ বুঝতে পারলো তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। সাদা রঙের একটি গাড়ি তার পিছু নিয়েছে। কিছুদুর এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরলো মাসুদ। নিশ্চিত হতে চায় সে। হ্যাঁ, গাড়িটি এখনো পিছু ছাড়েনি। সামনে একটি চৌরাস্তা। ডান দিকের রাস্তাটি প্রশস্ত। ওটিতে উঠে হঠাৎ গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো মাসুদ। সাদিক এতোক্ষণে চুপ ছিলো। এবার সে শব্দ করে হেসে উঠলো।

ঃ লাল সিগনাল জ্বলে উঠেছে। ওরা আটকা পড়েছে। মাসুদ ভাই!

ঃ তবুও সতর্ক থাকতে হবে। ওরা কারো পিছু নিলে সহজে ছাড়ে না। তবে ওদেরকেও আমি ছাড়বো না। এখন বল, কোথায় যেতে হবে?

ঃ মায়মানা সড়কে।

ঃ খান সাহেবের বাড়ি?

ঃ আপনি চিনেন?– হাসলো মাসুদ। উত্তর দিলো না।

ইশ্‌তিয়াক, শামছুদ্দীন ও গোলাম রব্বানী। তিনজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। এদেরকে নিয়ে যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া যায়। মাসুদ খুশি হলো ওদের পেয়ে।

ঃ ইশতিয়াক–তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমার সাথে বের হতে হবে।

ঃ আমি তৈরি মাসুদ ভাই।

ঃ প্রয়োজনীয় সব জিনিস সাথে নাও।

ঃ সব কিছু রেডি।

ঃ সাদিক, শামছুদ্দীন ও গোলাম রব্বানী–তোমরাও এখুনি বেরিয়ে পড়বে।

ঃ কোথায় যেতে হবে?–শামছুদ্দীনের প্রশ্ন।

ঃ জহীর শাহ্ স্ট্রিটে। পুলিশ ফাঁড়ি ছাড়ালেই দেখবে তিনতলা একটি নতুন বাড়ি। বাড়ির উপর তলায় রয়েছে কোকা কোলার বিজ্ঞাপন।

ঃ যার নীচে "রব্বানী সুপার মার্কেট?"

ঃ ঠিক ধরেছো! বাড়িটি সাদা। ওটির উপর নজর রাখবে তোমরা। বাহ্যত বাড়িটি প্রাইভেট কোম্পানীর অফিস হলেও ওটি উত্তরাঞ্চলীয় গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয়। আজ রাতে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি মিটিং হতে

যাচ্ছে। তোমাদের কাজ হলো- সেখানে লোক আসা শুরু হলে আমাকে সংকেত দেওয়া। পেজারে সংকেত পাঠাবে। তারপর সময়মত আমিই যোগাযোগ করবো। সুপার মার্কেটটিকে বাড়তি সুবিধা হিসাবে পাবে। জিনিস কেনার ছুতো ধরে খুব নিকট থেকে বাড়িটিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। কিন্তু সাবধান। মনে রাখবে, তাদের লোকও ঘোরাফেরা করবে তোমাদের সাথে।

ঃ আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন মাসুদ ভাই। আমরা সুষ্ঠুভাবেই আপনার নির্দেশ পালন করবো ইনশাআল্লাহ! –দৃঢ় প্রত্যয় গোলাম রব্বানীর কণ্ঠে।

মাসুদ ও ইশ্‌তিয়াক বেরিয়ে পড়লো একটি নতুন গাড়ি নিয়ে। সাদা মার্সিডিস গাড়ি। কিছুদূর অগ্রসর হতেই লোড শেডিং হলো। আকাশে শুক্লপক্ষেব অর্ধ চন্দ্র। তার হালকা আলোতে মাজার শরীফ নেয়ে উঠেছে। এই আঁধারে শহরকে ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে। বৈদ্যুতিক আলোতে নৈসর্গিক এই সৌন্দর্য এতক্ষণ চাপা পড়েছিলো। চোখ-কান খোলা রেখে গাড়ি চালাচ্ছে মাসুদ। পিছনে টিক্‌টিকি লাগলো কি না সেদিকেও দৃষ্টি তার। ব্যাক মিররটি ঠিকমত সেট করে নিলো।

ঃ আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি মাসুদ ভাই?

ঃ ইয়াসিন সাহেবের বাড়িতে। তোমার চেনার কথা নয়। সে বাড়ির এক মহিলা গতরাতে আমাকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করেছিলেন। তাদের এ পোশাকগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে।

বাড়ি হতে তিন'শ মিটার দূরে গাড়ি দাঁড় করালো মাসুদ। খুব ভালো করে চারপাশটা একবার দেখে নিলো। সন্দেহজনক কিছু নজরে এলো না। গতরাতের মত বাড়িটির দোতালায় আলো জ্বলছে, শুধু এ দিকটায় মানুষজনের আনাগোনা কম। চারদিকে কেমন শান্ত ভাব।

ঃ ইশ্‌তিয়াক, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আমাকে সংকেত পাঠাবে।

ঃ ঠিক আছে মাসুদ ভাই।

ঃ পিস্তলে সাইলেন্সার লাগিয়ে রাখো।

ঃ লাগানোই আছে।

মাসুদ নেমে পড়লো গাড়ি হতে। হাতে পোশাকের ব্যাগ, চারপাশটা আর একবার দেখে নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালো।

মহিলা দরজা খুলে ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। ঠোঁট দু'টো কিঞ্চিত নড়ে উঠলো। কিছু বলতে চাইলেন বোধ হয়। কিন্তু শব্দ বের হলো না। তাঁর চেহারায় ফুটে ওঠা ভয় ও বেদনার ছাপ মাসুদের দৃষ্টি এড়ালো না। সে আস্তে করে সালাম দিলো। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত একপাশে সরে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি তাঁর মাসুদের মুখে নিবদ্ধ। স্নেহভরা মিষ্টি দৃষ্টি। তবে তাতে বেদনার ছাপ। মাসুদ ভেতরে ঢুকলো। মহিলা দরজা বন্ধ করে দিলেন।

মাসুদ সোফাতে বসে পড়লো। মহিলা তখনো দাঁড়িয়ে। অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিনি।

ঃ কেমন আছেন?

ঃ ভালো! ব্যর্থ হাসার চেষ্টা করলেন তিনি। তুমি কেমন?

ঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ। ভালো! আপনাদের পোশাকগুলো ফিরিয়ে দিতে এলাম।

ঃ তুমি এখানে এসেছো– কেউ কি তা দেখেছে?

ঃ সম্ভবত না।

ঃ সকালে অতবড় একটা সত্য তুমি গোপন করেছিলে কেন বাবা?

ঃ আপনার সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলাম আমি।

ঃ তা দিয়েছিলে! কিন্তু.... তুমি একটু বসো। আমি আসছি। মহিলা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ঃ মোটেও ব্যস্ত হবেন না। আমার সময়কম। এক্ষুণি চলে যেতে হবে।

ঃ এখানে তোমার নিরাপত্তার অভাব হবে না। কিন্তু....

ঃ আমি সেই কিন্তুই শুনতে এসেছি।

ঃ আমি আগে বুঝতে পারলে অনেকগুলো সত্য কথা তাদেরকে বলতাম না। তোমার নামটি পর্যন্ত ওদেরকে বলে দিয়েছি। প্রথমে ব্যাপারটি.... বুঝতে পারিনি।

ঃ আপনি বিচলিত হবেন না। ঠিকই করেছেন আপনি।

ঃ না বাবা। ওদেরকে চেননা তুমি! বড় হিংস্র ও ভয়ঙ্কর ওরা।

ঃ আপনাদের প্রতি হুমকি দিয়েছে নিশ্চয়?

মহিলা চুপ রইলেন কিছুক্ষণ। মুখের ভীতির ছাপ লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি। মাসুদ জানতে চাইলো কে কে এসেছিলো। মহিলা এবার

ধীরে ধীরে বললেন–নাজিবুল্লাহ! পার্টির সিটি চেয়ারম্যান। পাকা কমিউনিস্ট। কমরেড। মাজার শরীফের মাস্তানদের লিডার। অনেক খারাপ লোক সে।

ঃ কখন এসেছিলো?

ঃ সকাল দশটার দিকে একবার। আর বিকালে একবার।

ঃ আপনাদেরকে কি বলে হুমকি দিয়েছে?

ঃ তা আর তোমার শোনার দরকার নেই বাবা। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন তিনি।– তুমি একটু বসো। আমি এক্ষুণি আসছি। মহিলা কক্ষান্তর হলেন। 'নাজিবুল্লাহ ও কাশেম দারোগা' নাম দু'টি মনে মনে ক'বার উচ্চারণ করলো মাসুদ। নাম দু'টি সে ইতিপূর্বে কয়েকবার শুনেছে। গত মাসে পাঁচজন মুজাহিদকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে গাছে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলো এই নাজিবুল্লাহ। এই নাজিবু.... ওয়ারলেসে সংকেত বেজে উঠলো, চিন্তা টুটে গেলো মাসুদের। দুইঞ্চি লম্বা চার কোণাবিশিষ্ট ছোট ওয়ারলেসটি পকেট হতে হাতে নিলো মাসুদ।

ঃ মাসুদ ভাই, ইশ্‌তিয়াক বলছি।

ঃ বল।

ঃ একটি গাড়ি এসে বাড়ির অদূরে দাঁড়িয়েছে। তার পিছে আরো একটি গাড়ি।

ঃ বলতে থাকো–

ঃ দু'জন লোক নামলো প্রথম গাড়ি হতে, বাড়িটির দিকেই দৃষ্টি তাদের। দ্বিতীয় গাড়ি হতেও দু'জন নেমে দাঁড়িয়েছে।

ঃ ওদের হাতে অস্ত্র আছে?

ঃ না। মনে হচ্ছে তারা বাড়িতে ঢোকার চিন্তা করছে।

ঃ তুমি সতর্ক ও নিকটে থাকার চেষ্টা করো। আমার জন্য চিন্তা করো না। খোদা হাফেজ। লাইন বিচ্ছিন্ন করলো মাসুদ। কপাল কুঞ্চিত হলো কিঞ্চিৎ। তাহলে শত্রুরা কি ওর পিছু নিয়েছিলো, না ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্য তারা পুনরায় এসেছে? প্রথম আশংকাটি সত্য হলে ভাবতে থাকে মাসুদ, ইয়াসিন সাহেবের পরিবারের জন্য সেটি হবে খুবই বিপজ্জনক। আর সে জন্য সকল দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে তাকে। সে-ই দায়ী এজন্য। আর দ্বিতীয়টি সত্য হলে তেমন বিপদ নয়। তবে সেটিও তাদের জন্য

অকল্যাণকর। চট্‌পট সিদ্ধান্ত নিলো মাসুদ। ছোট্ট একটি চিরকুট লিখে সে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লো।

মহিলা ফিরে এলেন কিছু পরে। কিন্তু একি? কোথায় সে যুবক। দরজার দিকে তাকালেন। দরজা ভেজানো। তবে সিটকিনি খোলা। বাইরে উঁকি দিলেন। কাউকে দেখলেন না। দরজার সিটকিনি এটে তিনি নিথর দাঁড়িয়ে রইলেন। ভয় করছে তার। ছেলেটি এভাবে না বলে চলে গেলো কেনো? হঠাৎ তার নজর পড়লো কাপড়ের প্যাকেটের উপর। দরজার ওপাশ থেকে পারভীনের গলা শোনা গেলো– আম্মু, নাশতা।

ঃ আয়, ভেতরে আয়। সে চলে গেছে রে।

ঃ চলে গেছে, না বলে।

হ্যাঁ, তোর ভায়ের কাপড়গুলো ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। আর মনে হচ্ছে কিছু লিখে রেখে গেছে। দেখতো।

নাশতা রেখে চিরকুটটি হাতে নিলো পারভীন। পড়তে শুরু করলো মনে মনে। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা–

শ্রদ্ধেয়া,

প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি না বলে চলে যাওয়ার জন্য। ডাইরিতে একটি ছবি দেখেছিলাম সকালে। কিন্তু সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার অবকাশ পেলাম না। অল্পক্ষণ পরেই নাজিবুল্লাহ ও কাশেম দারোগা আসতে পারে। আমি এখানে এসেছি তা তারা জানে না। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল দান করুন।

–আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী।

পারভীনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। ডাইরির মধ্যে তো ফাহিমার ভাই-এর ছবি। তাহলে কি ফাহিমার পরিচিতজন সে।

কিন্তু....

ঃ কি লিখে রেখে গেছেরে? মহিলার ব্যাকুল কণ্ঠ।

ঃ মা! তোমার কাছে-ই লিখেছে সে। লাইট অফ করে শীঘ্র ভেতরের ঘরে এসো! সব বলছি।

একদমে চিঠিটা পড়ে ফেলল ফাহিমা। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। এ'হাতের লেখা তার অত্যন্ত পরিচিত। এতো মাসুদের হাতের লেখা। তাহলে কি মাসুদ নিজেই এসেছিলো। সে....

ঃ তুই এ হাতের লেখা চিনিস ফাহিমা?

ঃ পারভীন। আমার খুব পরিচিত হাতের লেখারে। ওর চোখ চিক্ চিক্ করছে। এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে হয়ত।

ঃ খালাম্মা। ওর নাম কি মাসুদ?

ঃ হ্যাঁ মা! তুমি ওকে চেনো?

ঃ উঃ। আপনি কি করেছেন খালাম্মা। কেন আমাকে আগে বলেননি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি তাকে কটু কথা শুনিয়েছি।–খালাম্মা, কেন আপনি আমাকে বলেননি।

চিঠি দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফাহিমা।

ঃ কিন্তু মা! আমি তো জানতাম না।

ঃ ও ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশে বাড়ি। এখন কি হবে খালাম্মা। ওর যদি কোন ক্ষতি হয়। কাশেম দারোগা যদি ওকে ধরে ফেলে। নাজিবুল্লাহ যদি ওর সন্ধান পা....

কথা থেমে যায় ফাহিমার। কলিং বেলের শব্দ শুনে চমকে ওঠে। ওই এলো বুঝি কাশেম দারোগা। কি হবে এখন। মহিলার দৃষ্টি অবনত। গভীরভাবে কিছু ভাবছেন তিনি। পারভীন তাকালো ফাহিমার দিকে। ওর গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে। দৃষ্টি দরজার দিকে। ভয় মিশ্রিত ব্যাকুল দৃষ্টি। মনে হচ্ছে সে যেন কাঁপছে ভয়ে। আর একবার বেল পড়লো।

ঃ মা। দরজা খুলে দাও। বরফের মত ঠাণ্ডা গলা পারভীনের। ওঠে দাঁড়ালেন মহিলা। দু'পা অগ্রসর হলেন। মন্থর গতি।

ঃ খালাম্মা। উদ্বেগ ও ভয় জড়ানো কণ্ঠ ফাহিমার। মহিলা থেমে গেলেন। তারপর দৃষ্টি ফেরালেন ফাহিমার দিকে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ও ঘরে চলে গেলেন দরজা খুলতে। ফাহিমা তাঁর চলে যাওয়ার পানে অসহায়ভাবে চেয়ে রইলো।

ঃ আরো একবার বিরক্ত করতে এলাম আপনাকে– কাশেম দারোগার কর্কশ কণ্ঠ। মহিলা উত্তর দিলেন না। দরজার ওপাশে ফাহিমা ও পারভীন উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে। নাজিবুল্লাহ ঘরটা ভালো করে একবার দেখে নিলো। তাদের সাথে রাশিয়ার যে দু'জন সামরিক অফিসার এসেছে, তারাও ঘরটিকে

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

ঃ আপনার ছেলে আছে বাড়িতে? নাজিবুল্লাহর প্রশ্ন।

ঃ না, এখনো ফেরেনি।

ঃ রাতে কি সে প্রতিদিন দেরি করে ফেরে?

ঃ না।

ঃ আচ্ছা, তার ফেলে যাওয়া পোশাক তো আপনি ধুয়ে দিয়েছিলেন, তাই না? এক সামরিক অফিসারের প্রশ্ন। নাজিবুল্লাহ অনুবাদ করে দিলো।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তার অন্য কোন পোশাক-এই যেমন ধরুন, রুমাল– ফেলে রেখে গেছে কি?

ঃ না। একটু বসুন আপনারা। আমি এক্ষুণি আসছি।

ঃ না না! আপনার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। দারোগার কণ্ঠ। আপনি বুঝতে পারছেন না আমাদের এখন কি অবস্থা যাচ্ছে। হারামজাদাটিকে একবার নাগালের মধ্যে পেলে হয়। কিন্তু যাবে কোথায়। একটি পাখি পর্যন্ত বের হবার পথ বন্ধ এখান হতে। হঠাৎ কাশেম দারোগার মুখ হিংস্র হয়ে উঠলো।

ঃ সব ঘরগুলো আমরা একবার ঘুরে দেখতে চাই! অন্য সামরিক অফিসারটি মুখ খুল্লেন এতক্ষণে।

ঃ ভালো কথা। কিন্তু বাড়িতে তো কোন পুরুষ ছেলে....

ঃ সে জন্য আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমি আছি তো। নাজিবুল্লাহর মুরুব্বিয়ানা কণ্ঠ।

ঃ ঠিক আছে। কিন্তু আগে নাশতা করে নিন। ওনারা বিদেশী মেহমান।

ঃ সেটি না হয় পরে করা যাবে। আচ্ছা, আর একটি প্রশ্ন। তার শরীরে কি কোন ক্ষত ছিলো? প্রশ্ন করে মহিলার দিকে চেয়ে রইলো কাশেম দারোগা। খুবই গভীর ও তীক্ষ্ণ সে চাহনী।

ঃ হ্যাঁ, কপালে দু'টি ক্ষত ছিলো।

ঃ কপালে দু'টি –টেনে টেনে স্বগতোক্তি করলো কাশেম দারোগা। দেখুন; ওই কুত্তাটিকে ধরার ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য

আমাদের। কিন্তু কোন মিথ্যা বা ভুল তথ্য যদি আমাদের দেন, সেটির পরিণাম হবে খুব-ই ভয়াবহ। আমরা আপনার মেয়ে ও তার বান্ধবীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। মহিলা চুপ রইলেন এবার। কি বলবেন ভাবছেন তিনি। পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে–তিনি তা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন।

ঃ একটি ছেলেকে আপনাদের বাড়ি হতে বের হয়ে যেতে দেখলাম, কে ছেলেটি? নাজিবুল্লাহ প্রশ্ন ছুড়ে মহিলার দিকে চেয়ে রইলো। বুক দুরু দুরু কেঁপে উঠলো মহিলার। সত্য বলবেন, না মিথ্যা বলবেন। মিথ্যা বললে তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন হবে। আরো দশটি মিথ্যা বলতে হবে। তার থেকে সত্য বলাই শ্রেয়। নিশ্চয় এতক্ষণে ছেলেটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ঃ সেই তো এসেছিলো। আমার ছেলের এই পোশাকগুলো ফিরিয়ে দিয়ে গেলো। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

পরিস্থিতি হঠাৎ পাল্টে গেলো। সকলের চোখ ছানাবড়া। মহিলার দৃষ্টি অবনত। তিনি ভুল করলেন না ঠিক করলেন বুঝতে পারছেন না।

ঃ উহ! আপনি এতক্ষণ বলেননি কেনো? আর বসিয়ে না রেখে তাড়িয়ে দিলেন কেন? কাশেম দারোগার ব্যাকুল কণ্ঠ। ডান হাত দিয়ে সোফার উপর দু'বার ঘুষি মারলো সে।

ঃ কুইক কুইক। সামরিক অফিসার দু'জন উঠে দাঁড়ালো। নাজিবুল্লাহও ওঠে দাঁড়ালো। চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে তাদের। হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলো ঘর হতে। পোশাকের প্যাকেট নিয়ে কাশেম দারোগা বের হলো সবার পিছনে। যেতে যেতে বললো, "এবার এলে বসিয়ে রেখে আমাদের খবর দিবেন।"

মহিলা সৌজন্যবোধে উঠে দাঁড়াতে ভুলে গেলেন। মনে তার ঝড় বইছে। তিনি কি ঠিক করলেন। ছেলেটির কোন অমঙ্গল হবে নাতো। ওরা কি ছেলেটিকে ধরে ফেলবে? যদি ধরতে পারে- তাহলে...। হায় খোদা! আমি একি করলাম। তুমি ছেলেটিকে রক্ষা করো খোদা।

ওরা বের হবার সাথে সাথে ফাহিমা ও পারভীন ঢুকলো ঘরে। চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। মহিলা নিশ্চল দাঁড়িয়ে। ওদের উপস্থিতি টের পাননি বোধ হয়। তার চোখ দু'টি ভরে উঠেছে পানিতে।

ঃ মা! তুমি কেনো সত্যি কথা বলতে গেলে? পারভীন কথা বলে প্রথম।

ঃ খালাম্মা। এখন কি হবে। ও যদি ধরা পড়ে। ওকে যদি মেরে ফেলে ওরা...

মহিলা কোন উত্তর দিলেন না। ফাহিমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটছিলো মাসুদের। রাস্তার আবছা আলোতে নাজিবুল্লাহ ও কাশেম দারোগাকে চিনতে কষ্ট হয়নি তার। এক দুই করে পাঁচ মিনিট সময় পেরিয়ে গেলো। ওরা বাড়ি হতে এখনো বের হলো না। তাহলে কি ওদের উপর অত্যাচার চলছে। অমানুষগুলোর বিশ্বাস কি। মাসুদ নামবে বলে ভাবছিলো। বাড়ির পিছন দিকটায় গিয়ে একবার দেখা যেতে পারে। আরো এক মিনিট পার হয়ে গেলো। দরজায় হাত রাখলো মাসুদ। সে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঃ মাসুদ ভাই। ইশতিয়াকের কণ্ঠ। ওই দেখুন। ওরা হন্ত-দন্ত হয়ে ফিরে আসছে। স্টার্ট করবো?

ঃ একটু দাঁড়াও ব্যাপারটি বুঝতে হবে আগে।

ওরা ফিরে আসতেই গাড়ি হতে ড্রাইভারদ্বয় নেমে দাঁড়ালো। চারদিকটা একবার দেখলো তারা। তারপর ড্রাইভারকে কি জিজ্ঞেস করলো। ওদের গাড়ির দিকে হাত ইশারা করলো ড্রাইভারদ্বয়।

ঃ মাসুদ ভাই। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

ঃ হ্যাঁ, সামনে গিয়ে বামে মোড় নিবে। ওদিকটায় মানুষজন চলাচল কম। স্টার্ট করো গাড়িতে।

ওদের সাদা মার্সিডিস তীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনে নাজিবুল্লাহর গাড়ি। দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে উভয় গাড়ির মাঝে। ইশতিয়াকের দৃষ্টি সামনে। নিপুণ হাতে গাড়ি চালাচ্ছে সে। মাসুদের দৃষ্টি পিছনে। হাতে গ্রেনেডের ব্যাগ। মনে মনে কিছু একটা হিসাব কষছে সে। দূরত্ব আরো কমে এলো। পিছন দিক থেকে গুলি আসছে ঝাঁক ঝাঁক। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। টায়ারে লেগে হাওয়া চলে গেলে খুবই অসুবিধা হবে। রিস্ক নেয়া ঠিক হবে না আর। দু'টি গ্রেনেডের চাবী খুললো মাসুদ। তারপর আরো সূক্ষ্মভাবে হিসেব কষলো কিছুক্ষণ। এর মধ্যে চার সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। হাতে আর আছে তিন সেকেন্ড। চাবী খোলার সাত সেকেন্ড পর

গ্রেনেট বাষ্ট্র হয়। এবার আস্তে করে গ্রেনেড দু'টি ফেলে দিলো মাটিতে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। সামনের গাড়িটি উল্টে গেলো। তার উপর এসে উঠলো পিছনের গাড়িটি। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। দু'টি গাড়িই দুমড়ে মুচড়ে গেছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো কিছুদূর গিয়ে। গাড়ি থেকে রুমাল বের করে নাক চাপলো উভয়ে। আরো একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করলো মাসুদ। বেশিক্ষণ দেরি করা ঠিক হবে না এখানে। ওরা গাড়িতে উঠে বসলো। মায়মানা সড়কের দিকে গাড়ি ছাড়লো ইশ্‌তিয়াক।

রাত নয়টা বেজে পঞ্চাশ, ঘড়ি দেখলো মাসুদ। মাথায় নানান চিন্তা। একটু পরেই সারা শহর ছেয়ে ফেলবে সৈন্য বাহিনী। তন্ন তন্ন করে খুঁজবে তাকে। কিন্তু এখনো শামছুদ্দিনরা সংকেত পাঠাচ্ছে না কেন? এতো দেরি হওয়ার তো কথা নয়। তার ধারণা ভুল না হলে সাড়ে দশটার মধ্যে ওদের মিটিং-এ বসার কথা। হঠাৎ মাসুদ বুঝতে পারলো তার শীত করছে। এতক্ষণ টেনশনে থাকায় বুঝতে পারেনি। গাড়ির কাঁচ বন্ধ করে দিলো মাসুদ।

ওয়ারলেসে পি পি আওয়াজ হলো দু'বার। পকেট থেকে বের করে ওটি হাতে নিলো মাসুদ। আইয়াজ সাহেব কথা বলছেন।

ঃ জি, মাসুদ বলছি।

ঃ এই মাত্র খবর পেলাম-সাড়ে নয়টায় ছোট একটি বিমান ল্যান্ড করেছে এয়ারপোর্টে। ঊর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তা এসেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঃ কে হতে পারেন?

ঃ সেটি বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে....

ঃ আন্দ্রভিস্কো বলে ধারণা করছেন?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ আমারও ধারণা তাই। অতএব আজকের মিটিংটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলতে হবে।

ঃ নিঃসন্দেহে।

ঃ একটি সু-খবর শুনুন।

ঃ বলুন।

ঃ নাজিবুল্লাহ, কাশেম দারোগা ও দুজন রাশিয়ান সামরিক অফিসারকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ঃ সু-সংবাদই বটে। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন ও আপনার হাতকে আরো শক্তিশালী করুন।

ঃ ধন্যবাদ আপনাকে।

ঃ কালকের মুজাহিদ বুলেটিনের জন্য একটি ভালো সংবাদ পাওয়া গেলো। খোদা হাফেজ। লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিলেন আইয়াজ সাহেব।

মাসুদ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো। বাগলান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কাবুল থেকে আফগানিস্তানের কে.জি.বি প্রধানের আসার কথা নয়। নিশ্চয় গুরুতর কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে তারা। কিন্তু কি সেটি? প্রশ্নটি বার বার তার ব্রেনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শামছুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করলো সে।

ঃ কি খবর শামছুদ্দীন?

ঃ ঘন্টাখানেক আগে তিনটি গাড়ি বেরিয়ে গেছে গ্যারেজ থেকে। এখনো ফেরেনি। অন্য কোন লোকও ভেতরে প্রবেশ করেনি।

ঃ বিশেষ কোন তৎপরতা নজরে পড়ছে?

ঃ না!

ঃ বাড়ির পিছন দিকটায় গিয়েছ?

ঃ ওদিকটায় গোলাম রব্বানী রয়েছে। সাদিক মাহমুদ সামনের চা স্টলের ছেলেটির সাথে আড্ডা দিচ্ছে।

ঃ বাড়ির পিছন দিকটায় যে দু'টো লাইটপোস্ট রয়েছে-তাতে আলো জ্বলছে?

ঃ জ্বলছে!

ঃ গোলাম রব্বানীকে এক্ষুণি অকেজো করে দিতে বলো।

ঃ বলছি।

ঃ খুব সতর্কতার সাথে থাকবে। সময়মতো বাকি নির্দেশ দিবো আমি। খোদা হাফেজ–

ঃ মাসুদ ভাই!

ঃ বলো।

ঃ গাড়ি তিনটি ফিরে এসেছে। সাথে আরো কয়েকটি গাড়ি।

ঃ ধন্যবাদ তোমাকে। আল্লাহ তোমাদেরকে হেফাজত করুন। খোদা হাফেজ। লাইন বিচ্ছিন্ন করলো মাসুদ।

রাত দশটা ত্রিশ। শুক্লপক্ষের অর্ধচন্দ্র মাজার শরীফের পাহাড়ের ওপাশে হারিয়ে গেছে। আবছা আঁধারে মাজারকে তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ছে। কন্‌কনে হাওয়া শরীরের হাড্ডি মজ্জায় ঢুকে যাচ্ছে। মাসুদ এগিয়ে যাচ্ছে বিড়ালের মত নিঃশব্দে। সাথে ইশতিয়াক। চোখ কান খোলা তাদের। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ আসছে না কানে। মাজারের কোলাহল থেমে গেছে বেশ আগে। আকাশের তারারা মিটি মিটি হাসছে নীরবে।

লাইট পোস্টে আলো না থাকায় বাড়ির পিছন দিকটায় এখন ঘুটঘুটে আঁধার। বেশী দূরের জিনিস নজরে আসছে না। বেস্টনী প্রাচীর আর মাত্র বিশ মিটার দূরে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখে পলকহীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বাড়িটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো ক'বার। না, তেমন কিছু নজরে পড়ছে না। কোথাও ক্যামেরা ফিট করা আছে বলেও মনে হচ্ছে না। ঘরের জানালা সবগুলো বন্ধ।

উঁচু প্রাচীর টপকাতে অনেক কষ্ট হলো ওদের। ইশতিয়াক পায়ে ব্যথা পেয়েছে। খুঁড়িয়ে হাঁটছে সে। প্রাচীর থেকে ঘরের দূরত্ব দশ মিটার। এর মাঝে তিনটি ইউক্যালিপটাস ও একটি আম গাছ। মাটি ঘাসে মোড়া। সামনের দিকটা ভালো করে দেখে নিলো ওরা। গাছের উপরেও দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো ক'বার। না, কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ওরা পা টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিভাবে ঢুকবে বাড়ির মধ্যে। পিছন দিক হতে তো ঢুকার কোন পথ নেই। মাসুদের আশ্চর্য লাগছে–পিছন দিকটায় কোন প্রহরার ব্যবস্থা রাখা হয়নি কেন? না রাখা হয়েছে, কিন্তু ওরা বুঝতে বা দেখতে পাচ্ছে না। সেরূপ হলে জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়া মুশকিল হবে। চারদিকে আরো একবার দেখে নিলো মাসুদ। না, সন্দেহজনক কিছু নজরে এলো না।

মাসুদ চিন্তা করছে কিভাবে ভেতরে ঢুকা যায়। জানালার গ্রীলগুলো খুবই মজবুত। বাঁকিয়ে ভেতরে ঢুকা অসম্ভব। তবে গ্রীল কেটে ঢোকার ছোট্ট একটি লেসার মেশিন। লোহাকে লক্ষ্য করে সুইচে টিপ দিলে কচু কাটার মত লোহা দু'ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু তার পর। ভেতরে ঢুকার কোন নিদর্শন সে রাখতে চায় না। হঠাৎ থেমে গেলো মাসুদ। শক্তিশালী একটি ক্যামেরা ফিট করা! তাহলে কি শত্রুপক্ষ তাদের দেখে ফেলেছে। সময় দিচ্ছে শেষখেলাটি শুরু করতে।

ঃ ইশতিয়াক! মাথার উপর ক্যামেরা! ফিসফিসিয়ে বললো মাসুদ।

ঃ দেখেছি। আমার ধারণা ওটি এখন কাজ করছে না।

ঃ আমার ধারণাও সেরূপ। তবে মিটিং শুরুর আগে ওটি সচল হবে।

ঃ তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়তে হবে আমাদের।

ঃ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

ঃ কিন্তু কিভাবে? বলুনতো জানালা ভেঙ্গে ফেলি।

ঃ না। আমরা যে এখানে এসেছি তেমন কোন চিহ্ন রেখে যেতে চাই না।

ঃ তাহলে?

ঃ আমরা এ.সি. খুলে ভেতরে ঢুকবো। কাজটি যদিও কঠিন।

দক্ষ মেকানিকের মত চটপট এ.সি. খুলে ফেল্ল মাসুদ। প্রথমে ভেতরে ঢুকলো ইশতিয়াক। একটি শক্ত রশি দিয়ে এ.সি. কে বেধে রাখলো সে। যাতে বের হবার সময় ওটি বাইরের দিকে না পড়ে যায়। ইশতিয়াকের সংকেত না পাওয়া সত্ত্বেও হন্ত-দন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলো মাসুদ। ব্যথা পেলো তাড়াহুড়া করতে গিয়ে।

ঃ খারাপ কিছু মাসুদ ভাই?

ঃ হ্যাঁ। বাইরের আলো জ্বেলে দেয়া হয়েছে।

ঃ অর্থাৎ, ক্যামেরা।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি ধরো। এ.সি.টি যথাস্থানে রেখেদি।

ঃ কিন্তু, মাসুদ ভাই–

ঃ কথা বাড়িয়ো না।

অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। পর্দা সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ক'বার উঁকি দিলো মাসুদ। পিছন দিকটা আলোকে আলোকময়। বাতাসে গাছের পাতারা খেলা করছে। কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। সাদা আবরণে ঢাকা পড়ছে বাইরের মাজার। দু'বার সংকেত হলো অয়ারলেসে।

ঃ মাসুদ ভাই! আমি শামসুদ্দিন।

ঃ বলো।

ঃ তিনটি সামরিক গাড়ি দাঁড়ানো। ছয়জন লোক নেমে ভেতরে ঢুকছে।

ঃ আর কিছু?

ঃ না।

ঃ ধন্যবাদ। খোদা তোমা কল্যাণ করুন।

আল্লাহ হাফেজ।

এখনো মিটিং শুরু হয়নি তাহলে। ভাবতে থাকে মাসুদ। অর্থাৎ ক্যামেরাতে তার ছবি ধরা পড়েনি। আলো জ্বলার সাথে সাথে ক্যামেরা অন করা হয়নি হয়ত এতক্ষণে অন করা হয়েছে। মিটিং শুরুর আর দেরি নেই। ঝটপট কাজ করতে হবে।

ওরা এ ঘর হতে বের হলো। ডান দিকের প্যাসেজ ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলো। সামনে দোতালায় উঠার সিঁড়ি। চল্লিশ পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে সিঁড়ির মাথায়। কোথাও মানুষজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। খট্ করে দরজা খোলার শব্দ হলো সামনের দিকে। সাথে একটি কাশির শব্দ। ওরা সরে দাঁড়ালো ভারী পর্দার আড়ালে। লোকটি আরো একটি কাশি দিলো। মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে। এরপর 'কোজিভো' বলে দু'টি ডাক দিলো। পাশের রুম হতে এক যুবক বেরিয়ে এলো।

ঃ কিছু বলছেন?

ঃ হ্যাঁ, কন্ট্রোল রুমে একটু বসো তুমি। আমার বাথ রুম পেয়েছে।

ঃ কনফারেন্স কি শুরু হয়ে গেছে?

ঃ একটু পরেই হবে। আচ্ছা, পিছন দিকের একটি এ.সি. বাঁকা মত মনে হচ্ছে কেন? আগেতো অমন দেখিনি? স্ক্রিনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ঃ ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ হয়তো। তার কাজতো সারাদিন এটি খোলা আর ওটি লাগানো।

ঃ ঠিক আছে। তুমি বসো।

ইশতিয়াকের বুক কাঁপছে। মাসুদের কপালে চিন্তার ছাপ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এ.সি ঠিকমত ফিট করা হয়নি। এরূপ অসতর্কতা ঠিক হয়নি।

ওরা এবার সিঁড়ির প্যাসেজ ধরে এগোতে থাকলো। কিছু দূর যেতেই নীচে নামার সিঁড়ি পেলো। সিঁড়ির মধ্যে একটি একশ পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। সিঁড়ি বেয়ে ওরা পাশা-পাশি নেমে পড়লো। সামনের অনেকটা স্থান ফাঁকা। কোন ঘর নেই। মাটির নীচে এরূপ ফাঁকা স্থান রাখার কারণ খুঁজে পেলোনা মাসুদ। বাম দিকে তিনটি ঘর। এক পাশে লিফ্‌ট। মাসুদ একটি ঘরের নব ঘোরাতেই দরজা খুলে গেলো। ভেতরে ঢুকবে কি না ভাবছিলো সে। এমন সময় দেখলো, বাম দিকের করিডোর দিয়ে লোক আসছে। কাঁধে ভারী মেশিনগান। মাসুদ জানালায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চেয়ে আছে ওদের দিকে। ইশতিয়াকের হাত এর মধ্যেই পকেটে চলে গেছে। চোখের ইশারায় তাকে নিষেধ করলো মাসুদ। লিফটের সামনে এসে দু'জন দুদিকে চলে গেলো। জোরে একটি নিশ্বাস ছাড়লো ইশতিয়াক। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তার।

ঃ মাসুদ ভাই। পিছন দিকে ফিরে চমকে ওঠে ইশতিয়াক। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে এগিয়ে যায় মাসুদ। দু'জন লোক পড়ে আছে ফ্লোরে। শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে তাদের চামড়া তুলে নেয়া হয়েছে। ক্ষতস্থানে দানা দানা লবণ দেখা যাচ্ছে। নাকে মুখে রক্ত জমাট বাঁধা।

ঃ মাসুদ ভাই। বশির ও নাসির উদ্দীন। সকাল থেকে ওদের খোঁজ পাওয়া যাছিলো না। ওদের নিয়ে যেতে হবে মাসুদ ভাই।

ঃ ব্যস্ত হয়ো না। দেখি আদৌ বেঁচে আছে কিনা। কোন লাভ নেই ইশতিয়াক। নাড়ি পরীক্ষা করে বললো মাসুদ।

ঃ তবু ওদের লাশ নিয়ে যেতে হবে মাসুদ ভাই।

ঃ লাশের চেয়ে কনফারেন্স-এর বিষয়বস্তু জানা এ মুহূর্তে বেশি প্রয়োজন ইশতিয়াক।

ঃ কিন্তু–ভাঙ্গা গলা ইশতিয়াকের।

ঃ তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। ভুলে যেয়ো না তুমি একজন মুজাহিদ। লাশের উপর দিয়েই তোমার যাত্রা পথ। চলো, এখানে আর সময় কাটানো নয়। ওরা মাটির নীচ থেকে উপরে উঠে এলো। ইশতিয়াকের মুখটি ভারী ভারী। কিন্তু সেখানে কাঠোরতার চিহ্ন। মনে হচ্ছে চরম প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে সংকল্পবদ্ধ। মাসুদের মাথায় নানান চিন্তা। কোন্ রুমে কোন্ খানে কনফারেন্স হচ্ছে সেটি খুঁজে বের করা কঠিন। কোথায় কোন গার্ড রয়েছে, কোন ঘরে লোক রয়েছে– পূর্ব হতে কোন ইনফর্মেশন নেই তার নিকটে।

ওরা এখন দোতালার পূর্ব দিকের করিডোর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে মোটা কাপড়ের একটি পর্দা ঝুলছে। পর্দার আড়াল হতে সন্তর্পণে সন্ধানী দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো মাসুদ। সামনে একটি প্রশস্ত প্যাসেজ। প্যাসেজের অপর প্রান্তে বড় একটি হল ঘর। সেখানে তিন চারজন লোক দাঁড়ানো। তাদের হাতে ফাইলপত্র। ইশতিয়াক মাসুদের উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। পিছন দিকটা দেখার দায়িত্ব তার।

ঃ মাসুদ ভাই। কয়েকটি ছায়া দেখা যাচ্ছে। এদিকে আসছে।

ঃ পাশের রুমের দরজা খোলা। চলো ঢুকে পড়ি।

চট্পট ঢুকে পড়লো ওরা।

কথা বলতে বলতে তিনজন লোক চলে গেলো ঘরের সামনে দিয়ে। ঘরটিকে ভালো মত দেখলো মাসুদ। দু'টি টেবিলের উপর মোটা মোটা ফাইল পত্র। দেয়ালের গা ঘেঁষে দুটি স্টিলের আলমারী। ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজা অপর পাশে। অন্য রুমে যাওয়ার জন্যও একটি দরজা রয়েছে ডান দিকে। নবে মোচড় দিতেই সেটি খুলে গেলো। খুব সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকলো মাসুদরা। এটাও একটি অফিস রুম। টেবিলে পাঁচটি কম্পিউটার। সবকটি অন করা। একটির মনিটরে লাল অক্ষরে কিছু লেখা জ্বলছে নিভছে। এসট্রে হতে ধোঁয়া উড়ছে। অর্থাৎ একটু আগেও এখানে লোক ছিলো। কাজ করছিলো কম্পিউটারে। জানালা পথে সতর্কতার সাথে একবার তাকালো মাসুদ। কনফারেন্স রুমের সামনে বিশাল দেহী তিনজন লোক বসা। সম্ভবত

তারা গার্ড। মনে হচ্ছে তাকে কনফারেন্স এর পাশের রুমে পৌঁছাতেই হবে।

ঃ ইশতিয়াক। তুমি এখানেই অবস্থান করবে।

ঃ আপনি?

ঃ চেষ্টা করে দেখি কি করা যায়। খুব সতর্ক থাকবে। সর্বদা যোগাযোগ রাখবে। মনে রাখবে-এখানে আসার কোন চিহ্ন আমরা রেখে যেতে চাই না।

ঃ ঠিক আছে।

ঃ আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছি। বিপজ্জনক কিছু দেখলে সংকেত দেবে।

কনফারেন্স রুমের ভেন্টিলেটার দিয়ে একবার উঁকি দিলো মাসুদ। কিছু দেখা গেলো না। কিছু শুনতেও পেলো না। দরজার ভারী পর্দা সরিয়ে পাশের রুমে সন্ধানী দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো। দু'জন ছেলে ও তিনজন মেয়ে নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। টেন্সমিটার রুম-এটি। অত্যাধুনিক ফ্যাক্স ও টেলিফোন সেট কয়েকটি। লেটেস্ট আই.বি.এম. কম্পিউটার রয়েছে তিনটি। অয়ারলেস, ট্যালেক্সসহ আরো অনেক যন্ত্রপাতি। মাসুদ খুব সতর্কতার সাথে সূক্ষ্ম সাউন্ডক্যাচ মেশিনটি ওয়ালের সাথে সেঁটে দিলো। তার পর কান পেতে বসে রইলো।

ঃ আজকের এ কনফারেন্সে আমার আসার কথা ছিলো না। আন্দ্রোভিস্কো কথা বলছেন। মিঃ দাভিস্কার উপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু তবুও আমি আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনাদের জানা আছে হয়তো–সম্প্রতি আমরা বিভিন্ন জায়গায় চরমভাবে মার খাচ্ছি। গত দু'সপ্তাহে কাবুলে গোপন অভিযান চালিয়ে আমাদের অনেকগুলো অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল রাতে মাজার শরীফের প্রবেশদ্বারেও নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে। একটু আগে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে-মাজারের পুলিশ সুপার ও মিঃ নাজিবুল্লাহসহ আমাদের দুজন মেজরকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কে এসব অঘটনের হোতা? কে ঘটাচ্ছে এসব?

ঃ স্যার, আমার যতদূর মনে হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে বিশেষ কোন ব্যক্তি এটি করছে। দাভিস্কা ধীরে বললো কথাগুলো।

ঃ হ্যাঁ, এসবের নায়ক এক বিদেশী।

ঃ বিদেশী।

ঃ বাংলাদেশের অধিবাসী সে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, নাম মাসুদুর রহমান। দুঃসাহসিক কাজের জন্য ইতিমধ্যেই সে হিরো বনে গেছে মুজাহিদদের মধ্যে। সে এখন কিংবদন্তির নায়ক। আরো মজার কথা হলো, সে এখন এই মাজারেই অবস্থান করছে।

ঃ কিন্তু স্যার, আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি ধৃত ব্যক্তিদ্বয় হতে কথা বের করতে। কিন্তু ওরা প্রাণ দিলো। কথা বললো না।

ঃ খাঁটি মুসলমানদের চরিত্রই ওরূপ। প্রাণের চেয়ে ওদের কাছে আদর্শ বড়। যা হোক, আগামীকাল সূর্যাস্তের পূর্বে আমি মাসুদ নামের সেই নায়ককে আমার সামনে চাই।

ঃ স্যার, সুঁই খোজার মত তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে আমাদের লোকেরা।

ঃ থাক ওসব। এবার মূল আলোচনায় আসা যাক। কর্নেল আমীন ও ফিলাতফ সাহেব–বাগলান আক্রমণের পরিকল্পনা কতদূর আপনাদের?

ঃ আমাদের পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এখন আপনার রিপোর্টের অপেক্ষা মাত্র। কর্ণেল ফিলাতফ উত্তর দিলো।

ঃ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাগলান আক্রমণ করা বাঞ্ছনীয়। নয়তো মুজাহিদরা আরো শক্তি সঞ্চয় করবে। তখন ব্যাপারটি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ঃ তারা কি ধরনের শক্তি দিয়ে আমাদের প্রতিহত করতে পারে স্যার? কর্নেল আমীনের প্রশ্ন।

ঃ ট্যাংক ও বিমান বিধ্বংসী কামান রয়েছে তাদের কাছে। হেভী মেশিনগানসহ ভারী ভারী অস্ত্রও রয়েছে। তাদের যোদ্ধা সংখ্যা পাঁচশ'র মতো।

ঃ মুজাহিদদের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা দিলে আমাদের বিমান বাহিনীর খুব সুবিধা হবে। আমরা আক্রমণ করার পরপরই তারা বোমা বর্ষণ শুরু করবে।

ঃ আন্দ্রোকিভা।

ঃ জি স্যার ।–আন্দ্রোকিভা তাঁর পিএ

ঃ কম্পিউটারে মুজাহিদদের অবস্থানের যে ছক আঁকা হয়েছে, সেটা ওদের বুঝিয়ে দাও।

মাসুদ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলো। চোখ দু'টি লাল হয়ে উঠেছে। হিংস্র দেখাচ্ছে তাকে। পর্দার আড়াল থেকে আরো একবার উঁকি দিয়ে এলো ওঘরে। লোকগুলো আগের মতই কাজ করছে। একটি মেয়ে একবার পর্দার দিকে তাকালো। ক্ষিপ্রগতিতে সরে দাঁড়ালো মাসুদ। আবার কথা শুরু হয়েছে। মেশিনের কাছে গিয়ে চুপ করে বসলো সে।

ঃ মিঃ আমীন সাহেব।

ঃ জি স্যার।

ঃ কবে আক্রমণ করতে চান।

ঃ আগামীকাল রাতে স্যার বাগলানবাসীর ঘুম আর ভাঙ্গতে চাই না।

ঃ কতগুলো রাসায়নিক অস্ত্র আনানো হয়েছে মিঃ কিসমিওভিতা?

ঃ পঁচিশটি।

ঃ কাল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাগলানে আমাদের পতাকা উড়বে স্যার। ফিলাতফের কণ্ঠ।

ঃ ধন্যবাদ। যা হোক, এবার আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই। মিঃ আন্দ্রোস্কোভ।

ঃ জি স্যার। আন্দ্রোস্কোভ মাজারের কমাণ্ডো বাহিনীর প্রধান।

ঃ আপনার কাছে পঞ্চাশজন বাছাই করা সৈন্য হবে?

ঃ হবে স্যার।

ঃ তাদের দিয়ে কি কোন প্রতিরোধ মোকাবিলা করা যাবে?

ঃ জি স্যার।

ঃ ভেরী গুড। তাহলে শুনুন আপনারা। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থের প্রফেসর ছিলেন মিঃ আহসান হাবিব। আমাদের আফগান প্রবেশের পর তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। পঞ্চাশ উর্ধ্বএই প্রফেসর, কৃতদার। তিনি গবেষণা করে মারাত্মক এক অস্ত্র আবিস্কারের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছেন। মুজাহিদরা তাঁকে তাঁর নিজ দেশে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। মজার ব্যাপার হলো

ইনিও একজন বাংলাদেশী নাগরিক। এক গোপন তথ্যে জানা গেছে, প্রায় তিন হাজার বাংলাদেশী মুজাহিদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। যা হোক, এই প্রফেসরকে আমাদের উঠিয়ে আনতে হবে।

ঃ তিনি কোথায় অবস্থান করছেন? আন্দ্রোস্কোভের প্রশ্ন।

ঃ খলম নদীর তীরে হিন্দুকুশ এলাকায়। মুজাহিদরা সেখানে তাঁর জন্য একটি গবেষণাগার তৈরি করে দিয়েছে। তিনি যে অস্ত্রটি আবিষ্কার করছেন তা অত্যন্ত ভয়াবহ। এটির মালিক মুসলমানরা হলে বিশ্ব শাসন করার আমাদের স্বপ্ন সাধ মিটে যাবে চিরতরে। কেননা, খুব দ্রুত আরো কয়েকটি মুসলিম দেশ এসব অস্ত্রের মালিক হয়ে দাঁড়াবে।

ঃ অস্ত্রটির ক্ষতিকর দিকগুলো কি?

ঃ অস্ত্রটি অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড। নির্দিষ্ট কমাণ্ড দিয়ে সে অস্ত্র ব্যবহার করলে ৩০০ কিঃ মিঃ এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত সকল সৈন্য (কমাণ্ড অনুযায়ী) নিহত হবে।

ঃ এটি খুবই মারাত্মক অস্ত্র স্যার। সি.আই. এ কি এ ব্যাপারে কোন তথ্য পেয়েছে?

ঃ সেটিই আমাদের প্লাস পয়েন্ট। আমি চাই রাশিয়াই হোক এ অস্ত্রের একমাত্র মালিক।

ঃ সেটিই হবে স্যার। আপনি শুধু মুজাহিদদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিন। আমি কমাণ্ডো বাহিনী দিয়ে চিলের মত ছোঁ মেরে উঠিয়ে আনবো তাকে।

ঃ অতো সহজে সেটি হবে না আন্দ্রোস্কোভ, মুজাহিদদের শক্ত ঘাঁটি সেখানে। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদ দ্বারা তাঁকে হেফাজত করা হচ্ছে।

ঃ তবুও স্যার, আমার এ বাহিনী দ্বারা অসাধ্য সাধনও সম্ভব।

ঃ সেটি যথাসময়ে দেখা যাবে। কিন্তু আমি চাই এ অপারেশনটিও যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা হোক।

ঃ আগামী পরশু সেটি করতে চাই স্যার।

ঃ তোমার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসের একটি লিস্ট দাও আমাকে। আমি যথাসময়ে তা পৌঁছানোর নির্দেশ দেবো। আন্দ্রোকিভা।

ঃ জি স্যার।

হিন্দুকুশ গবেষণাগারের যে ছবি উঠানো হয়েছে, সেগুলো আন্দ্রোস্কোভকে দেখিয়ে দাও। সাথে সাথে মুজাহিদদের অবস্থানের চিত্রটিও তাকে বুঝিয়ে দাও।

অয়ারলেসে শব্দ হলো । ইশতিয়াক কথা বলছে–

ঃ মাসুদ ভাই, আপনি যে দিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন, দু'জন লোক সেদিকে যাচ্ছে। তারা কিছু খুঁজছে বলে মনে হয়।

ঃ ধন্যবাদ, আর তেমন কিছু নজরে পড়ছে?

ঃ না। আপনার খবর কি?

ঃ কনফারেন্স প্রায় শেষ। সব কথা রেকর্ড করা হয়েছে। তবে আমরা বের হবো একটু পরে। আরো কিছু কাজ আছে। কম্পিউটার হতে সব তথ্য ছবি ও প্লান চুরি করতে হবে। সতর্ক থেকো। খোদা হাফেজ।

মাসুদ এক ফাঁকে ঘরটিকে ভালো করে দেখে নিলো। আত্মগোপনের জন্য একটি জায়গাও ঠিক করে রাখলো। যে কোন মুহূর্তে প্রয়োজন হতে পারে।

আরো কিছুক্ষণ পর কনফারেন্স শেষ হলো। ঘড়ি দেখলো মাসুদ। রাত বারোটা ত্রিশ। সাউন্ডক্যাচ মেশিনটি যত্ন করে রেখে দিলো ব্যাগে। পর্দার ফাঁক দিয়ে ও ঘরে আরো একবার উঁকি দিলো। লোকগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে একে একে। এতক্ষণ ধরে তারা কি কাজ করছিলো? ভাবতে থাকে মাসুদ। কনফারেন্স এর সকল কথা ও ছবি ধারণ করছিলো হয়ত। যা হোক সেটি পরে ভাবা যাবে। এখন শামসুদ্দিন ও গোলাম রব্বানীর সাথে যোগাযোগ করা দরকার। ওয়ারলেস হাতে নিলো মাসুদ।

ঃ শামসুদ্দিন।

ঃ জি।

ঃ শোন, কতজন লোক বের হয়ে যায় বাড়ি থেকে তা আমাকে বিস্তারিত জানাবে।

ঃ জি।

ঃ অন্য কোন তৎপরতা নজরে পড়ছে?

ঃ সিভিল পোশাকে কিছু লোক পাহারা দিচ্ছে বলে মনে হয়।

ঃ তারা কতক্ষণ পাহারা দেয় সেটিও আমাকে জানাবে।

ঃ ঠিক আছে মাসুদ ভাই।

ঃ আর বাড়ির পিছন দিকটার আলোগুলো কখন অফ করা হয় সেটিও জানাতে বলবে গোলাম রব্বানীকে। বের হবার সময় তোমাদের সাহায্য লাগতে পারে। আল্লাহ হাফেজ।

মাসুদের কিছুতেই ঘুম আসছে না। এপাশ-ওপাশ করে অনেকক্ষণ কাটালো। কি জঘন্য ষড়যন্ত্র সে আজ উদঘাটন করলো। রাতের এই শেষ প্রহরে বাগলানবাসী ঘুমাচ্ছে। আগামী কালও তারা এভাবেই ঘুমাবে। কিন্তু তারা জানে না তাদের সে ঘুমকে শেষ ঘুমে পরিণত করার নীল নক্‌শা ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে।

ঘড়ি দেখলো মাসুদ। রাত তিনটা। ভোর হবার এখনো দুঘণ্টা বাকি। দুঘণ্টা অনেক সময়। অত দেরি সহ্য হচ্ছে না তার। ডিস্কগুলো কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দেখা দরকার আছে। কিন্তু এখানে তো কম্পিউটার নেই। আইয়াজ সাহেবকে এতো রাতে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো সে।

সাদিক মাহমুদের ডাকা-ডাকিতে জেগে উঠলো মাসুদ। চোক দুটি ভীষণ লাল। মাথা ভারী হয়ে আছে। শরীর খারাপ করবে নাকি? আলস্য ঝেড়ে উঠে পড়লো এক সময়। তারপর নামায আদায় করে ওয়ারলেস হাতে নিলো।

ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। শুভ সকাল। মাসুদ বলছি।

ঃ ওয়া আলাইকুস্‌সালাম। কেমন আছেন?

ঃ ভালো। অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।

ঃ দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার জন্য বলতে পারেন সারা রাত জেগেই ছিলাম। এখন বলুন খবর কি কাল রাতের?

ঃ সে জন্যই এই সাত সকালে যোগাযোগ করা।

ঃ বলুন?

ঃ আপনার কাছে কি আই.বি. এম. কম্পিউটার আছে?

ঃ বাসাতে নেই। হাসপাতালে আছে।

ঃ ওহ! বাঁচালেন। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

ঃ কেন।

ঃ তাদের সব গোপন তথ্য ও প্লান ডিস্কে কপি করে এনেছি। ওটি দেখেই সেভাবে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঃ বাগলান কবে আক্রমন করতে চায় ওরা?

ঃ আজ রাতে। যাহোক, আরো অনেক কথা। সাক্ষাতে ছাড়া সেসব বলা যাবে না।

ঃ কিন্তু আপনি বের হবেন কিভাবে? কাল রাতের ঘটনার পরতো ওরা পাগলা কুকুরের ন্যায় হন্যে হয়ে উঠেছে।

ঃ আপনাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আপনি হাসপাতালে চলে আসুন এক্ষুণি।

ঃ O.K.

ঃ আল্লাহ হাফেজ।

কুয়াশা ঢাকা শুভ্র সকাল। রাস্তাঘাট ফাঁকা। নামায সেরে দু'একজন মুসল্লী মসজিদ হতে ঘরে ফিরছে। মাসুদের গাড়ি খাজেগান সড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। চোখ কান খোলা। ব্যাক মিররে একবার নজর দিলো। কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাশে বসা সাদিক মাহমুদ। তাকে কেমন উদাস মনে হচ্ছে। ওরা এক সময় হাসপাতালের নিকটে পৌঁছালো। চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলো মাসুদ।

মনিটরের উপর পলকহীন দৃষ্টি মাসুদের। প্লানটা ভালো করে মুখস্থ করে নিচ্ছে। বাগলানে মুজাহিদদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের তথ্য সম্পূর্ণ সত্য। অন্য দিকে খলম তীরের হিন্দুকুশ গ্রামের অপারেশনের প্লানটি খুবই সূক্ষ্ম বলে মনে হচ্ছে মাসুদের। ওরা খুব অল্প সময়ে প্রফেসার আহসান হাবিবকে তুলে আনতে চায়।

ঃ হিন্দুকুশ গবেষণাগার সংরক্ষণের দায়িত্ব কার উপর আইয়াজ সাহেব? স্ক্রিনে নজর রেখেই জানতে চাইলো মাসুদ।

ঃ বশির আহমেদ-এর উপরে। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা তিনি।

ঃ তাঁর সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে এক্ষুণি।

ঃ সেটি অসুবিধা হবে না। কিন্তু তার আগে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তাদেরকে ইনফর্ম করা দরকার। সর্বোপরি আরো অস্ত্রের প্রয়োজন হতে পারে। সেখানে বিমান বিধ্বংসী ট্রেঙ্গার আছে কি না সেটাও আমাদের জানা নেই।

ঃ ঠিক আছে। এক্ষুণি কেন্দ্রে ও বশির সাহেবকে ফ্যাক্স পাঠিয়ে দিন। আর আমি যে প্লান তৈরি করে দিচ্ছি সে অনুযায়ী তাঁকে কাজ করতে বলুন। বেশি সৈন্যের প্রয়োজন নেই। কি কি অস্ত্র লাগবে এবং সেগুলো কোথায় কোথায় সেট করতে হবে তারও একটা ছক আমি একে দিচ্ছি।

ঃ কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যে নতুন অস্ত্র এনে তা যথাস্থানে সেট করা কি সম্ভব হবে?

ঃ সম্ভব করতে হবে? প্রফেসর হাবিব মুসলমানদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

ঃ তাঁকে কি আপাততঃ ওখান হতে সরিয়ে রাখতে হবে?

ঃ অবশ্যই।

ঃ আচ্ছা, ওরা কি আহসান হাবিব সাহেব-এর অন্য আর একটি আবিষ্কার সম্পর্কে কোন তথ্য জানে?

ঃ কোনটি?

ঃ রঞ্জন রশ্মি।

ঃ রঞ্জন রশ্মি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ এ ব্যাপারে আমিতো কিছু জানি না।

ঃ এ রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে এক হাজার কিঃ মিঃ মধ্যে কোথায় কি হচ্ছে তা ঘরে বসে দেখা যাবে।

ঃ কিভাবে?

ঃ এ রশ্মি উঁচু এন্টেনার মাধ্যমে যে দিকে প্রেরণ করা হবে, সে দিকের সব ছবি স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। এটির আবিষ্কারেও তিনি শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন।

ঃ যাহোক, ওদের সব প্লান আমাদের বানচাল করতেই হবে। ওদের স্বপ্ন অংকুরেই বিনাশ করতে হবে।

ঃ কিন্তু বাগলানের ব্যাপারটি।

ঃ দুশো দুর্ধর্ষ যোদ্ধার প্রয়োজন আমার।

ঃ কিন্তু অতো যোদ্ধাতো এখানে নেই।

ঃ অস্ত্র?

ঃ সেটিও এখানে নেই।

ঃ যোগাড় করার কোন পথ নেই?

ঃ আছে। কিন্তু এতো অল্প সময়ে...

ঃ অল্প সময়ে এমন অনেক কিছু করা যায়, যা সময় পেলেও করা যায় না। ওরা বাগলানকে জনবানবহীন করে দিতে চায়। ওরা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করতে চায়।

ঃ সে সুযোগ তাদের দেয়া হবে না। আপনার যা যা প্রয়োজন তার একটা লিষ্ট দিন আমাকে। কোথায় কিভাবে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে তারও একটি ছক তৈরি করে ফেলুন। আর আপনি কি মাজার থেকে এখনই বেরিয়ে যেতে চান?

ঃ না। তবে কখন তা আপনাকে যথাসময়ে জানাবো। অনেক কাজ বাকি এখনো।

ঃ তা হলে–

ঃ শামসুদ্দীন ও গোলাম রব্বানীকে আগে পাঠিয়ে দিবো। তারা প্লান অনুযায়ী কাজ করতে থাকবে। আমি পরে তাদের সাথে মিলিত হবো। ইশতিয়াক আমার সাথে থাকবে।

ঃ আপনি যেভাবে চাইবেন সেভাবেই হবে।

ঃ আমাকে এখন উঠতে হবে।

ঃ উঠবেন, কিন্তু......

ঃ বলুন।

ঃ শহরে চলাচল করা মোটেও নিরাপদ নয় আপনার জন্য। অন্তত আজ সন্ধ্যার মধ্যে যখন আপনাকে গ্রেফতার করার কথা।

ঃ কিন্তু বসে থাকলে তো কাজ চলবে না।

ঃ তা ঠিক। তবে...

ঃ আমি সতর্ক থাকবো। বাকি খোদার ইচ্ছা। একটা মটর সাইকেল প্রয়োজন আমার।

ঃ যথাসময়ে পৌঁছে দেয়া হবে। আর ইয়াসিন সাহেবের ফ্যামিলির নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের উদাসীন হওয়া ঠিক হবে না।

ঃ হ্যাঁ, আমি খোঁজ নেবো।

ঃ রাতে একবার খোঁজ নিয়েছি আমি।

ঃ খারাপ কিছু?

ঃ তেমন না। তবে খুবই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সবাই বলা চলে এক প্রকার গৃহবন্দি। আতংকের মধ্যে সময় কাটছে তাদের।

ঃ আমি এখন উঠবো।

ঃ একটু বসুন। বাহিরটা ভালো করে দেখে আসি।

ঃ তেমন কিছু নজরে এলে সাদিক মাহমুদ খবর দিতো।

ঃ তবুও....

প্রয়োজন নেই। আল্লাহ হাফেজ।

কুয়াশাকে তাড়িয়ে দিয়ে সূর্য অনেক উপরে উঠে এসেছে। ঘড়ি দেখলো মাসুদ। সকাল নয়টা। দোকান-পাট খুলতে শুরু করেছে। গাছের পাতায় রোদ লুকোচুরি খেলছে। মাসুদের নজর বার বার ব্যাক মিররের উপর আছড়ে পড়ছে। না, সন্দেহজনক তেমন কিছু নজরে পড়ছে না। অনেকক্ষণ চুপ থেকে এবার মুখ খুলল মাসুদ।

ঃ সাদিক মাহমুদ।

ঃ বলুন মাসুদ ভাই।

ঃ তোকে একটি কাজ করতে হবে।

ঃ আমি প্রস্তুত।

ঃ ইয়াসিন সাহেবের বাড়ি যেতে হবে।

ঃ কোন সময়? বলুনতো এখনই যাই।

ঃ না, তোকে অন্যভাবে যেতে হবে। সেখানে ছদ্মবেশে পুলিশ পাহারা চলছে। কিন্তু... কিছুক্ষণ চুপ রইলো মাসুদ। কিছু একটা ভাবছে গভীরভাবে।

ঃ মাসুদ ভাই, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে ভাই বলুন শুধু। আমি তা ঠিকমত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

ঃ তোর উপর সে বিশ্বাস আমার আছে। শোন, ও বাড়ির একটি ডাইরীতে মাহবুবুল্লাহর ছবি দেখেছিলাম।

ঃ মাহবুব ভাই-এর ছবি।

ঃ হ্যাঁ, আমার ধারণা ফাহিমার কোন খবর হয়ত পাওয়া যাবে সেখান হতে।

ঃ তাহলে আমি এক্ষুণি যাবো মাসুদ ভাই।

ঃ ব্যস্ত হোসনে। ও বাড়ির মহিলাকে আমি একটা চিঠি লিখে দেবো। তাছাড়া তাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার হচ্ছে কিনা সেটাও আমাদের দেখা কর্তব্য। তুই ছোট আছিস। অন্দর মহলেও ঢুকতে পারবি। আগে আস্তানায় চল। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

অ্যাসিসট্যান্ট পুলিশ অফিসারের খাপছাড়া প্রশ্নে ইয়াসিন সাহেব খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। তিনি পর পর দু'রাত বাড়িতে ছিলেন না। বলতে গেলে তিনি কিছুই জানেন না। তবে তাঁর স্ত্রীকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। তিনি মেপে মেপে কথা বলছেন। উত্তর দিচ্ছেনও চিন্তা-ভাবনা করে।

ঃ সে কি আবার আসবে এমন কোন ইঙ্গিত আপনাকে দিয়েছিলো।

ঃ না। মহিলার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ঃ কাল রাতে যখন সে এসেছিলো–তার কাছে কোন অস্ত্র ছিলো?

ঃ সেতো খালি হাতেই এসেছিলো।

আপনার মেয়ে ও তার বান্ধবীকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।

ঃ তারাতো ওর সামনেই আসেনি, কথাও বলেনি।

ঃ তবুও। ওরাইতো প্রথমে উঠিয়ে এনেছিলো।

ফাহিমা ও পারভীন এ রুমে এলো। মুখ ছাড়া ওদের সমস্ত শরীর ঢাকা। উভয়েই বেশ গম্ভীর। মুখ ভার। ফাহিমার চোখ ফোলা ফোলা। মনে হয় কিছু আগে কেঁদেছিলো।

ঃ আপনারা দু'জনেইতো পরশু রাতে লোকটিকে ঘরে তুলেছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, পারভীন কথা বললো। ফাহিমা মাথা নাড়লো।

ঃ লোকটির ডান চোয়ালে বড় একটি তিল আছে কি? ফাহিমার বুক দুরু দুরু কেঁপে উঠলো। তবে কি মাসুদের ছবি আছে ওদের কাছে। মাসুদের সৌন্দর্যকে তো ওই তিলটি অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। একবার ওই তিল নিয়ে সে একটি কবিতা লিখেছিলো।

ঃ বলতে পারবো না। পারভীনের উত্তর।

ঃ কেন? ও সময় কি বাইরে লাইট ছিলো না।

ঃ ছিলো। তবে লোকটির মুখ ছিলো রক্তাক্ত। আর তাতে ছিলো কাদা মাটির প্রলেপ।

ঃ দেখুন তো-এই ছবির লোকটি রাতের সেই আগন্তুক ব্যক্তি কি না? একটি ছবি বের করে পারভীনের সামনে ধরলেন পুলিশ সুপার।

ঃ সরি। আমি বলতে পারবো না।

ঃ আপনার বান্ধবী?

ঃ আমিও বলতে পারবো না। খুব মৃদু ফাহিমার কণ্ঠ। তার মনে হচ্ছে ছবিটি ছোঁ মেরে কেড়ে নেয় পুলিশ সুপারের হাত থেকে। বুকের ধুঁক-ধুঁকানি আরো বেড়ে গেছে ফাহিমার। সে হঠাৎ উঠে ভেতরে চলে গেলো।

ঃ উনি চলে গেলেন কেন?

ঃ ওর শরীরটা খারাপ। বোধ হয় ভালো লাগছে না। মহিলার শান্ত স্বর। তারপর ছবিটি হাতে নিয়ে বললেন-হ্যাঁ, এই ছবির লোকটিই রাতের সেই ছেলে।

ঃ ধন্যবাদ আপনাদের। আমি এখন উঠবো। তা একটি অনুরোধ আপনারা সহযোগিতা করবেন আমাদের।

ঃ আপনাদের প্রতিটি জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দিয়েছি আমরা। একজন মুমূর্ষুব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়া কি অপরাধ।

ঃ না না। আপনি তেমনটি মনে করবেন না।

ঃ তাছাড়া তার সাথে ছিলো সরকারি সৈন্যের পোশাক। সরকারি সৈন্য ভেবেইতো তাকে আমরা সেবা করেছি।

ঃ আচ্ছা উঠি এবার। মহিলা দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ঃ আমার খুবই ভয় করছেরে পারভীন?

ঃ মাসুদ ভাইকে ওরা ধরতে পারবে না। মিছে ভয় পাচ্ছিস তুই।

ঃ ওর ছবিটি পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে। কোথায় পেলো ওর ছবি?

ঃ কে. জি.বি-র লোকেরা সংগ্রহ করেছে। মনে হলো বক্তৃতা করা অবস্থায় ছবিটি ওঠানো।

ঃ ও এ বাড়িতে রাত কাটালো– পরদিন আবার এলো-অথচ আমার সাথে দেখা হলো না। আর একবার কি আসবে না?

ঃ আসা নিরাপদ নয়। তাঁকে হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে।

ঃ কিন্তু ও যদি ধরা পড়ে....

ঃ তুই অহেতুক দুশ্চিন্তা করছিস। আয় বুলেটিন পড়ি। আব্বু সকালে নিয়ে এসেছেন। কথা শেষ করে বুলেটিন হাতে তুলে নেয় পারভীন। মিনিট খানিক পড়ার পর সে আনন্দ ধ্বনি করে উঠে। দেখ দেখ ফাহিমা, মজার খবর। নাজিবুল্লাহ ও কাশেম দারোগাকে হত্যা করা হয়েছে।

ঃ কি বললি?

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখ। ওর পাশে এসে পড়তে থাকে–

গতকাল রাত নয়টার দিকে মুজাহিদদের গ্রেনেড হামলায় মাজারের সন্ত্রাস, খোদাদ্রোহী কমরেড নাজিবুল্লাহ, ইসলাম বিদ্বেষী পুলিশ অফিসার কাশেমসহ দু'জন রাশান সামরিক কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করেছে। খবরে প্রকাশ–

ঃ দাঁড়া দাঁড়া। রাত নয়টার দিকে–। অর্থাৎ

ঃ আমাদের বাড়ি হতে বের হবার পরপরই। নিশ্চয়ই এ মাসুদ ভাই-এর কাজ। আমার ভীষণ আনন্দ লাগছে ফাহিমা, তিনি আশে পাশে কোথাও পালিয়ে ছিলেন নিশ্চয়ই। আম্মু-আব্বু দেখে যাও মজার খবর।

ওর আনন্দ দেখে ফাহিমার মুখে হাসি ফুটলো। গর্বে ওর বুকটা ভরে গেলো। টপটপ করে দুফোঁটা আনন্দ অশ্রু ঝরে পড়লো চোখ হতে।

বাদাম-বাদাম ভাজা। গরম বাদাম ভাজা। বাইরে একটা বাচ্চা কণ্ঠ শোনা গেলো। চল্ ফাহিমা। বাদাম ভাজা খাই।

ঃ কিনে আন। ঘরে বসেই খাবো।

পারভীন দরজা খুলে বাদামওয়ালাকে ডাক দিলো। ওর সামনে এসে দাঁড়ালো ছেলেটি।

ঃ বাদাম ভালো?

ঃ হ্যাঁ। এখনো গরম রয়েছে। একটু আগে ভেজেছি।

ঃ দু'শো গ্রাম দে।

ঃ আপা, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। ঘরে বসে এক গ্লাস পানি খেতে পারি?

ঃ আয়, ভেতরে আয়।-তুই ওজন কর। আমি পানি আনছি। পা বাড়ায় পারভীন।

ঃ আপা শুনুন। দাঁড়িয়ে পড়ে পারভীন। আমি পানি খাবো না।

ঃ তবে যে বললি?

ঃ এজন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটি।

ঃ ঠিক আছে। বাদাম ওজন কর।

ঃ করছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলতে চাই। পুনরায় মুখ নীচু করলো। পারভীনের কেমন মনে হলো ছেলেটিকে। সাধারণ বাদাম বিক্রি করা ছেলের সাথে কোথায় যেন এর পার্থক্য রয়েছে।

ঃ কি কথা, বল।

বেশ ক সেকেণ্ড চুপ রইলো ছেলেটি। তারপর মাথা তুলে পারভীনের দিকে তাকালো। মায়া জড়ানো করুণ চাহনী।–বল, কি কথা তোর? রিপিট করলো পারভীন। ছেলেটি এবার খোলা দরজার দিকে তাকালো। কপাল কুঞ্চিত হলো পারভীনের। কে এই ছেলেটি? এমন আচরণ করছে কেন ও? কি চায় সে?

ঃ দরজা বন্ধ করে দেবো?

মাথা ঝাঁকালো ছেলেটি। পারভীন দরজা বন্ধ করে দিলো।

ঃ আমাকে ক্ষমা করবেন আপা। বাধ্য হয়ে এমন আচরণ করেছি। ছেলেটিকে হঠাৎ চালাক ও স্মার্ট মনে হলো। ও কথা বলে যাচ্ছে–আমি বাদামওয়ালা নই।

ঃ তুই বাদামওয়ালা নস্। দু' পাশের খোলা জানালার দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেরালো পারভীন।

ঃ আমাকে চিনবেনও না। আমি আপনার আম্মার সাথে কথা বলতে চাই।

ঃ আম্মার সাথে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কে পাঠিয়েছে তোকে?

ঃ ক্ষমা করবেন, আমি শুধু তাঁর সাথেই কথা বলতে চাই। অনুগ্রহ করে যদি তাঁকে একটু ডেকে দেন। আর এই নিন আপনার বাদাম।

ঃ আমার বাদাম লাগবে না। তুই বোস্। আমি আম্মুকে ডেকে আনছি।

একটু পরে মহিলা এলেন। পিছনে পারভীন। উভয়ের চোখে বিস্ময়। ছেলেটি ভদ্রভাবে সালাম দিলো।

ঃ তুমি আমার সাথে দেখা করতে এসেছে?

ঃ জি।

ঃ কোথা থেকে আসছো?

ঃ আমি মাজারেই থাকি।

ঃ কে পাঠিয়েছে তোমাকে?

ঃ আপনার একটা চিঠি আছে? উত্তর এড়িয়ে গেল ছেলেটি।

ঃ দাও দেখি।

চিঠি বের করার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না ছেলেটির মধ্যে। খোলা জানালার দিকে সে বার বার দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো। ব্যাপার বুঝে পারভীন জানালা বন্ধ করে দিলো। এবার ছেলেটি তার বাদামের ডালির নীচ থেকে একটি চিঠি বের করলো। সাথে একটি মুজাহিদ বুলেটিন। মহিলা প্রথমে চিঠিটি খুললেন। পরিচিত হাতের লেখা দেখে তিনি চমকে উঠলেন। মেয়ের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন মাঝে। পারভীন মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। হাতের লেখাটি তারও পরিচিত। মহিলা পড়তে লাগলেন মনে মনে–

মা.

আমার সালাম জানবেন। আপনাদের বড় কোন সমস্যা হচ্ছে কি না সে খোঁজ আমি অহরহ রাখছি। ছেলেটি আমার নিজস্ব। একজন মুজাহিদ সে। তাকে পাঠালাম একটি ছবি সম্পর্কে জানার জন্য। আশাকরি সহযোগিতা করবেন। ছবিটি আমার এক বন্ধুর। তার বোন হারিয়ে গেছে। তাকে খুঁজছি আমি। সময় ও নিরাপত্তার জন্য নিজে আসতে পারলাম না।

দোয়া করবেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করবো না।

ইতি–

আপনার সন্তান সম

মাসুদুর রহমান।

চিঠিটি পড়া শেষ হতেই ছেলেটি ওটি ছোঁ মেরে নিয়ে নিলো। তারপর কুটি কুটি করে ছিড়তে শুরু করলো।

পারভীন, বাদাম আনতে গিয়ে কি হারিয়ে গেলি চলে এঘরে প্রবেশ করলো ফাহিমা। বিস্ময়ে হতবাক সে। কে এই ছেলেটি-সাদিক মাহমুদ।

ঃ আপা আপনি। আপনি এখানে। আমি আপনাকে খুঁজতে...

ঃ তুই কি ছিঁড়ছিস সাদিক?

ঃ মাসুদ ভাই-এর চিঠি। পারভীন উত্তর দিলো।

ঃ তোর সাথে ওর দেখা হয়েছে? এখন কোথায় সে?

ঃ ব্যস্ত হয়ো না মা! সে ভালো আছে। ওকে নাশতা দাও। তারপর কথা বলো।

ঃ আমি বসতে পারবো না। বাড়ির চারদিকে টিকটিকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

ঃ তোকে এক্ষুণিই ছেড়ে দিবো। আয় ভেতরে আয়! নাশতা করে তারপর যাবি। ফাহিমা ওকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলো।

মাগরিবের আযান হচ্ছে মসজিদে। মাসুদকে খুব চঞ্চল দেখাচ্ছে। স্থিরভাবে কোন কাজ করতে পারছে না। এক ফাঁকে অযু সেরে নামায পড়ে নিলো। শত্রু বাহিনী হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। সংবাদ পাওয়া গেছে

ইতোমধ্যে পাঁচ-সাত জায়গায় হানা দিয়েছে তারা। রাস্তা-ঘাটে কাউকে সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে কাগজ পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। হোটেলে গিয়েও তাকে কয়েকবার সন্ধান করা হয়েছে।

কাপড় চোপড় পরে প্রস্তুত হলো মাসুদ। ইশতিয়াক আগেই প্রস্তুত ছিলো। ঘড়ি দেখলো এবার। সাতটা পনেরো। অর্থাৎ এখনো বিশ-ত্রিশ মিনিট দেরি করতে হবে। অন্ধকার নামার পূর্বে বের হওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সাদিক মাহমুদ এখনো এলো না কেন? তার কোন বিপদ হলো না তো? সেকি কোন তথ্য আনতে পারবে?

ঃ মাসুদ ভাই! আমরা কখন বের হচ্ছি?

ঃ ঠিক সাতটা পঁয়তাল্লিশে। কিন্তু সাদিক তো এখনো এলো না।

ঃ সেটিই ভাবছি আমি। কোন বিপদ বা অঘটন ঘটলো নাতো?

ঃ বুঝতে পারছি না। যা হোক, আরো পনেরো মিনিট সময় আছে হাতে। তুমি এ ফাঁকে ডিনামাইট ও অন্য অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করে নাও।

ঃ ঠিক আছে মাসুদ ভাই।

ঃ শেষ বারের মত আইয়াজ সাহেবের সাথে একবার যোগাযোগ করে নিই। সাতটা চল্লিশ এখন। মামুনকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিলো মাসুদ। মামুন খান সাহেবের বাড়ির তদারককারী। খুবই বিশ্বস্ত। ওরা বেরিয়ে পড়লো।

ঃ পাঁচ মিনিট বাড়ির বাইরে অবস্থান করবো আমরা।

ঃ কেন? জানতে চাইলো ইশতিয়াক।

ঃ মূল অপারেশনে যাওয়ার আগে নিশ্চিত হতে চাই আমি– কেউ আমাদের ফলো কছে কিনা।

ঃ ঠিক আছে চলুন।

বাইরের অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে পূর্ব আকাশে। মেঘ থাকায় তার আলো এসে পৃথিবীতে পড়ছে না। বাড়ি থেকে আটশ মিটার দূরে ওরা অবস্থান নিলো। রাস্তা-ঘাট অনেকটা ফাঁকা। নয়টার দিকে কারফিউ দেয়া হবে– এজন্য হয়ত। চোখ-কান খোলা ওদের। না, তেমন কিছু নজরে আসছে না। মিনিটের কাঁটা পঁয়তাল্লিশের ঘর ছাড়িয়ে গেছে। ওরা উঠবে ভাবছিলো। মাসুদ মটর সাইকেলের সিটে বসলো।

ঃ মাসুদ ভাই! ইশতিয়াকের ব্যাকুল কণ্ঠ।

ঃ কি?

একটি ট্যাক্সি। অনেক দূরে দাঁড়ালো। ওই যে– ইউক্যালিপটাস্ গাছের নীচে।

ঃ হ্যাঁ, তুমি ওই প্রাচীরের আড়ালে যাও। আমি এ দিকটায় আছি।

ট্যাক্সি হতে এক কিশোর নামলো। তারপর নামলো এক বোরকা পরা মহিলা। হাঁটার ভাব দেখেই বুঝলো মাসুদ– সাদিক ওটি। কিন্তু সাথের মহিলাটি কে? ইয়াসিন সাহেবের স্ত্রী হয়ত। মাসুদের ভীষণ রাগ হলো সাদিকের উপর। কেন সে ঝামেলা করতে গেলো? এ ধরনের ঝুঁকি নেয়া তার মোটেও ঠিক হয়নি। তারপর আবার নয়টার দিকে কারফিউ শুরু হবে।

ঃ ইশতিয়াক! ওই ট্যাক্সিকে কোন গাড়ি অনুসরণ করছে কিনা সেটি দেখা দরকার।

ঃ যতদূর মনে হচ্ছে–অনুসরণ করছে না। সাদিক ও বোরকা পরা মহিলা আস্তে আস্তে খান সাহেবের বাড়িতে ঢুকে পড়লো।

ঃ সাতটা পঞ্চাশ মাসুদ ভাই। পাঁচ মিনিট ইতোমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে।

ঃ হ্যাঁ, চলো। এখন প্রতিটি সেকেণ্ডের অনেক মূল্য। এ পাঁচ মিনিট অন্যভাবে পুশিয়ে নিতে হবে। ওরা মটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে বড় রাস্তার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মামুন দরজা-জানালা বন্ধ করে রেডিও নিয়ে বসার চিন্তা করছিলো। এমন সময় নক হলো দরজায়। ও সচকিত হলো। কে এলো আবার। শত্রু নয়তো। কিন্তু না, নকটি নির্দিষ্ট সাংকেতিকভাবেই হচ্ছে। মাসুদ ভাইয়েরা আবার ফিরে এলো নাকি? না সাদিক মাহমুদ। ও ধীর পায়ে এসে দরজা খুলে দিলো।

ঃ সাদিক তুমি! এতো দেরি করলে কেন?

ঃ বলছি সব, ভেতরে চলুন মামুন ভাই।

ঃ কিন্তু....

ঃ আমার বোন ফাহিমা আপা।

ওরা ভেতরে গিয়ে বসলো। ছিমছাম গোছালো ঘর। দেয়ালে কয়েকটি

কোরআনের আয়াত টাঙ্গানো। এক পাশে যুদ্ধরত মুজাহিদদের ছবি। ফাহিমাকে ব্যাকুল দেখাচ্ছে। দৃষ্টি স্থির নয়। এদিক ওদিক ঘুরছে বার বার। বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপন। গলাও শুকিয়ে আসছে। দেখা হলে প্রথমে সে কি বলবে। নিশ্চয়ই ওকে দেখে মাসুদ আশ্চর্য হবে প্রথমে। তারপর ঠোঁটের কোনে ফুটে উঠবে হাসি। ডান চোয়ালের বড় তিলটি তার হাসিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে।

ঃ আপনার কি শরীর খারাপ আপা? মামুনের কথায় কল্পনার জাল ছিঁড়ে যায় ফাহিমার। শান্ত হবার চেষ্টা করে সে।

ঃ না! সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ঃ কি খাবেন বলুন? গরম কফি আছে।

ঃ না না! ব্যস্ত হতে হবে না।

ঃ সাদিক তুমি বসে রইলে কেন? তুমি তো আর মেহমান নও। মামুন কৃত্রিম ধমক দিলো।

ঃ মামুন ভাই বসুন। মাসুদ ভাই কোথায়?

ঃ চলে গেছেন।

ঃ কোথায়? বুকের মধ্যে ধাক্কা খেলো ফাহিমা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশ্নটি মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে।

ঃ আপা! তিনি কোথায় যান, কোথায় থাকেন, কাকপক্ষিও জানে না। আমিতো কোন্ মামুন।

ঃ কখন ফিরবে?

ঃ সেটিও বলা সম্ভব নয়। তাঁর তো সবেমাত্র ভোর হলো।

ঃ কতক্ষণ হলো বেরিয়েছেন? সাদিকের প্রশ্ন।

ঃ তোমরা আসার মিনিট দুই আগে।

ঃ ইস্।

ঃ সাদিক! আমাকে রেখে আয়। চোখ ছল ছল ফাহিমার। মুখ ঘুরিয়ে নিলো সে।

ঃ আমি দুঃখিত আপা।

ঃ নটায় কারফিউ শুরু হবে সাদিক। উঠ, চল। শক্ত হবার চেষ্টা করছে

ফাহিমা। পারছে না। বুক ভরা কান্না চাপা দেয়া খুবই কষ্টকর। তার মাথার মধ্যে কেমন করছে। ঘুরে পড়ে যাবে নাকি?

ঃ মামুন ভাই একটা ট্যাক্সি আনতে হবে।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ! তুমি বসো, আমি এক্ষুণি ডেকে আনছি। তবে উনাকে রেখে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। তোমার কিছু কাজ আছে। বেরিয়ে গেলো মামুন।

রব্বানী সুপার মার্কেটের সামনে এসে হান্ড্রেড ইয়ামাহার গতি কমিয়ে দিলো ইশতিয়াক। মাসুদ নেমে পড়লো ঝটপট। ইশতিয়াক তার পিছু নিলো। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে দু'জন উপরে উঠে গেলো। লোহার গেটের সামনে এক রাশিয়ান বসা। ইয়া বপু! অটুট স্বাস্থ্য। সম্ভবত ক্যারাত ট্যারাত জানে।

ঃ কি চাই? তার কণ্ঠ গম গম করে বেজে উঠলো।

ঃ ভেতরে ঢুকতে চাই! মাসুদের উত্তর।

ঃ কি কাজে?

ঃ সেটি ভেতরে গিয়েই বলতে চাই।

ঃ প্রবেশ নিষেধ। রুক্ষ হয়ে উঠছে লোকটি।

ঃ কিন্তু আমাদের প্রয়োজন।

ঃ এখানেও মাথায় হেলমেট কেন? খুলুন আগে। মাসুদ হেলমেট খুল্লো। বেশ কিছুক্ষণ মাসুদের দিকে চেয়ে রইলো লোকটি। মনে হচ্ছে কিছু খুঁজছে সে। তারপর দরজা খুলে দিলো। মাসুদ ও ইশতিয়াকের চোখে চোখে কথা হয়ে গেলো এর মধ্যে। মাসুদ এক পা ভেতরে দিতেই লোকটি ইশতিয়াককেও জোর করে ভেতরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ততক্ষণে মাসুদের পিস্তল তার মাথা ফুটো করে দিয়েছে। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলে শব্দ হলো না ঠিকই। তবে ওর পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। লোকটি মাটিতে পড়ে গোঙ্গাচ্ছে। গোঙ্গানোর শব্দ শুনে ইনফর্মেশন রুম হতে দুজন লোক ছুটে এলো। হাতে পিস্তর তাদের। সময় নষ্ট করা বা হাঙ্গামা করা ঠিক হবে না– ভাবলো মাসুদ। শান্তভাবে ওরা

চারজনের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। হোচট খাওয়া বাচ্চাদের মত মোজাইক করা ফ্লোরে পড়ে গেলো তারা। রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে এঁকেবেকে।

ঃ ইশতিয়াক! তুমি ঝটপট ডিনামাইটগুলো ফিট করে দাও। আমি দেখছি সব দিক।

ঃ ঠিক আছে মাসুদ ভাই।

ঘড়ি দেখলো মাসুদ। আটটা চল্লিশ। আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি কারফিউ শুরু হতে। এর মধ্যেই ওদেরকে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

নীচে নেমে এলো ওরা। চারদিকটা ভালো করে দেখলো একবার। না, তেমন কিছু নজরে এলো না। রাস্তা ঘাট প্রায় ফাঁকা। মানুষজন ঘরমুখী। ঘড়ির দিকে নজর সকলের। মটর সাইকেলে স্টার্ট দিলো ইশতিয়াক। মাসুদ পকেট থেকে রিমোটকন্ট্রোল বের করলো। ইশতিয়াক ক্লাচ চেপে ধরে গিয়ার চেঞ্জ করলো। ইয়ামাহা ছুটে চললো সামনের দিকে। রিমোটকন্ট্রোলের বাটনে টিপ দিলো মাসুদ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে মাজার-ই-শরীফ কেঁপে উঠলো। মাসুদ পিছন দিকে চেয়ে দেখলো কুণ্ডলি পাকিয়ে উপরে উঠছে আগুন। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো ইশতিয়াকের। কিছুদূর গিয়েই গতি শ্লথ করলো ইশতিয়াক। সামনে ব্যারিকেড। দুধারে মেশিনগান হাতে সৈন্য দাঁড়ানো। ওরা গাড়ির কাগজ-পত্র চেক করছে। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে তারাও সচকিত ও শংকিত। ওয়াকি-টকিতে কথা বলছে একজন। ওদের সামনে মাত্র একটি গাড়ি। পিছনে কোন গাড়ি নেই।

ঃ কি করবো মাসুদ ভাই।

ঃ দাঁড়াবে।

ঃ কিন্তু কোন কাগজ-পত্রতো নেই গাড়ির। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সও নেই।

ঃ তুমি কথা বলবে। কাগজ-পত্র বের করার ভান করবে। বাকিটা আমি করবো।

এরিমধ্যে সামনের গাড়িটা বেরিয়ে গেলো। ক'মিটার সামনে এলো ইশতিয়াক। অফিসার গোছের একজন কাগজ চাইলো।

ঃ লাইসেন্স? ইশতিয়াকের প্রশ্ন।

ঃ গাড়ির কাগজও।

ঃ আচ্ছা, দিচ্ছি।

ঃ দু'জনেই তোমরা হেলমেট খোলো।

ঃ খুলছি স্যার। ইশতিয়াককে ইশারা করলো মাসুদ। সে গাড়ি এক পাশে দাঁড় করানোর ভান করে সোজা সামনের দিকে একটি গ্রেনেড মেরে দিলো। ওদের মেশিনগান তাক করার পূর্বেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। আরো একবার কেঁপে উঠলো গোটা এলাকা। মাজার-ই-শরীফ। পিছন দিকে তাকালো মাসুদ। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে উপরে। আকাশের মেঘমালা হালকা হয়ে এসেছে এতক্ষণে। শুক্লার চাঁদ উঁকি দিচ্ছে পৃথিবীতে।

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত। পাহাড়ি বন্ধুর পথ। ওদের ইয়ামাহা রাতের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভাঙ্গাচোড়া কখণ্ড মেঘ। তাদের মাঝে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। শরীরের রক্ত জমিয়ে দিতে চাইছে। ঘড়ি দেখলো মাসুদ। দশটা বেজে পাঁচ। অর্থাৎ এক ঘণ্টা আগে মাজার ছেড়েছে তারা। রুশ বাহিনী খ্যাপা নেড়ির মত ঘেউ ঘেউ করছে আর খুঁজছে তাকে। মাইল মিটারের উপর দৃষ্টি দিলো সে। মাত্র ত্রিশ কিঃ মিঃ আসা হয়েছে। এখনো বাকি হয়তো বিশ পঁচিশ কিঃ মিঃ– মনে মনে হিসাব কষতে থাকে মাসুদ। সময় আছে হাতে পঁচিশ মিনিট। এর মধ্যে তাকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতেই হবে। বামে মোড় নিলো এবার। সামনে বড় একটি পাথর। অনেক কষ্টে তাতে আঘাত খাওয়া হতে বাঁচলো মাসুদ।

ঃ আগামী পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছানো কি সম্ভব হবে ইশতিয়াক?

ঃ আর মাইল দুই গেলে ভালো রাস্তা পাওয়া যাবে।

ঃ তা হলে আমরা ঠিক সময় পৌঁছাতে পারছি, কি বলো?

ঃ ইনশাআল্লাহ।

সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। অন্তত শামসুদ্দীনের তাই মনে হচ্ছে। ব্যাকুলতাও বাড়ছে সাথে সাথে। অস্থিরভাবে পায়চারী করছে এদিক ওদিক।

মাঝে একবার মুজাহিদদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে এলো। ঘড়ির উপর দৃষ্টি ফেলল একবার। দশটা বিশ। সাড়ে দশটার মধ্যে মাসুদ ভাইর পৌঁছানোর কথা– ভাবতে থাকে সে। তাঁর কোন অকল্যাণ হয়নিতো। যদি তিনি না আসেন– সে পারবে তো এ গুরুদায়িত্ব পালন করতে? পারতে তাকে হবেই। তাঁর এঁকে দেয়া ছক অনুযায়ী-ই তো সে যুদ্ধ করবে। ভয় কিসের? মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। জীবন প্রদীপ নিভে যাবে আজই। নচেৎ হাজার হাজার বাগলানবাসীর তাজা রক্তে মাটি লাল হয়ে উঠবে। ওরা শহরের সকল মানুষকে মেরে ফেলতে চায়। ওদের সে আশা দুরাশা বানিয়ে দিতে হবে। ওর চিন্তায় ভাটা পড়লো। একটি নিশাচর পাখি বিকট শব্দ করে পূর্ব দিকে উড়ে গেলো। শামসুদ্দীন আর একবার ঘড়ি দেখলো।

খোলম শহরের দক্ষিণ দিকে মরুভূমির বুকে বেশ কতক পাহাড় । এর অনতিদূরে বাগলান– মাজার সড়ক। সড়কটি এখানে ইংরেজী‘সি’ অক্ষরের মত বাঁকা। মাসুদ এখানেই মুজাহিদ বাহিনীকে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে। তাঁর নির্দেশ মত শামসুদ্দীন সমস্ত বাহিনীকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছে। তাছাড়াও পাহাড়ের পিছনেও সতর্কতার জন্য কিছু মুজাহিদকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। অন্য দিকে খোলম শহরে রাখা হয়েছে তিনটি দল। এদের কাজ হলো দু’টি। শত্রু সৈন্য পিছু হটলে তাদের বাধা দেয়া এবং মাজার থেকে নতুন সৈন্য এলে তাদের প্রতিহত করা। এদলের দায়িত্ব রয়েছে গোলাম রব্বানীর উপর।

মাসুদরা খোলমের উপকণ্ঠে যখন পৌঁছালো, রাত তখন দশটা পঁচিশ।

ঃ মাসুদ ভাই, সামনে রাস্তা বন্ধ! ইশতিয়াকের ব্যাকুল কণ্ঠ। সে ড্রাইভিং করছে।

ঃ দাঁড়িয়ে যাও।

ঃ কিন্তু.....

ঃ গোলাম রব্বানীর কাজ এটি।

ঃ প্রায় আধা মিনিট নীরবতার মধ্যে কাটলো ওদের। ঝোঁপঝাড় হতে কেউ বেরিয়ে এলো না।

ঃ মাসুদ ভাই, কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

ঃ গোলাম রব্বানী এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তুমি একটুও নড়াচড়া

করো না। আর মটর সাইকেল সামনে এক ইঞ্চিও চালিয়ো না। তাহলে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে তোমার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। কথা শেষ হতেই গোলাম রব্বানী ঝোঁপ হতে বেরিয়ে এলো। সাথে সাত আট জন মুজাহিদ। তাদের পজিশনের খোঁজ খবর নিয়ে মাসুদরা সামনে অগ্রসর হলো। যেতে যেতে বললো– তুমি শামসুদ্দীনকে জানিয়ে দাও যে, আমরা পৌঁছে গেছি।

ঃ ঠিক আছে মাসুদ ভাই। আল্লাহ হাফেজ।

মাসুদের উপস্থিতি মুজাহিদদের মনে সাহসের সঞ্চার করলো। শামসুদ্দিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। তাকে সাথে করে পাঁচটি ঘাঁটি ঘুরে ঘুরে দেখলো মাসুদ। যেখানে যা ভুল ও অসতর্কতা দেখলো তা সুধরিয়ে দিলো। প্রত্যেক দলনেতাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সতর্ক সংকেত ভালো করে বুঝিয়ে দিলো। সব সেরে যখন সে হালকা হলো– ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় একটা ছুঁই ছুঁই করছে।

নিঝুম নিস্তব্ধ চতুর্দিক। কোথাও সাড়া শব্দ নেই। সমস্তই একটা গুমোটভাব। ঝড়ের পূর্বলক্ষণ যেন। মরুর ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের রক্তকে হিম করে দিচ্ছে। অপূর্ণ চন্দ্র পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে। মাসুদের মনে নানান চিন্তা। সাথে একরাশ আশংকা। শত্রুরা তাদের পরিকল্পনা বাতিল করে নি তো? করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দু'দুটো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে সন্ধ্যা রাতে। কিন্তু পরক্ষণে আবার মনে হলো– না, ওরা আক্রমণ করবেই। পরাজয়ের প্রতিশোধ তারা নিবে।

পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠছে মাসুদ। ডান পায়ের গিট ব্যথায় টাটাচ্ছে। এতক্ষণ ব্যস্ত থাকায় বুঝতে পারেনি। ব্যথার স্থানটা একটু ম্যাসেজ করলো। চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার উঠতে লাগলো। পাহাড়ী গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাদের আলো তার মুখের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে। দূরের মরুভূমিকে চাঁদের আলোয় মায়াভরা সমুদ্র বলে মনে হচ্ছে তার। একটি নিশাচর পাখি ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেলো। মাসুদের সাথে রয়েছে ইশতিয়াক ও আরো দু'জন মুজাহিদ। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বাকি মুজাহিদদের সাথে মিলিত হলো মাসুদ। অস্ত্রগুলো ভালো করে একবার পরীক্ষা করে নিলো।

ঘড়িতে দুইটা বাজতে দশ মিনিট বাকি । অর্থাৎ শত্রুদের পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই। সকল দলনেতার সাথে যোগাযোগ করলো মাসুদ। পুনরায় তাদেরকে সংকেত না দেয়া পর্যন্ত গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করলো। কারণ, মূল অভিযানের দু'কিলো মিঃ আগে একটি অনুসন্ধানী গাড়ি থাকবে। এই গাড়ির নিরাপত্তা সংকেত পেলেই মূল অভিযান সুম্মখে অগ্রসর হবে। আর অনুসন্ধানী গাড়িটি অনেক আগে পাঠানো হবে শুধু এই জায়গার জন্য। অর্থাৎ শত্রুরা এই জায়গাটিকে আগে থেকেই সন্দেহযুক্ত হিসাবে ধরে নিয়েছে।

অয়ারলেসে সংকেত হলো দু'বার। পকেট থেকে বের করে কানের কাছে ধরলো মাসুদ। গোলাম রব্বানী কথা বলছে-" শত্রু সৈন্য পৌঁছে গেছে।"

ঃ তোমাদের উপস্থিত যেন টের না পায়।

ঃ নিশ্চিন্তে থাকুন মাসুদ ভাই।

ঃ খোদা হাফেজ। ধন্যবাদ তোমাকে।

ঃ খোদা হাফেজ।

নড়ে বসলো মাসুদ। সময় বয়ে যাচ্ছে প্রতীক্ষায়। সেকেন্ড ও মিনিটকে অনেক লম্বা মনে হচ্ছে তার। এক ফাঁকে সব দল-নেতার হাতে। কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তায় আলো পড়তে দেখা গেলো। ক্রমেই নিকটে আসছে সে আলো। এক সময় গাড়িটি নজরে এলো। হেড লাইট থেকে দু'পাশের লাইটে পাওয়ার বেশি। রাস্তার দু'পাশে তীব্র আলো ফেলে গাড়িটি ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। বিচিত্র ধরনের গাড়ি। এটিকে সাঁজোয়া যান বলা চলে না। মাসুদের পলকহীন দৃষ্টি গাড়ির উপর। ক্রমেই গাড়ির গতি কমে আসছে। এক সময় দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়িটি। মাসুদের কপাল কুঞ্চিত হলো। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে সেখানে। এতো ঠাণ্ডায়ও মাসুদ ঘামতে পারে-এমুহূর্তে তাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। তবে কি ওরা আমাদের পরিকল্পনা জানতে পেরেছে? ভাবতে থাকে মাসুদ। কিন্তু তা কি করে সম্ভব। হয়ত জায়গাটি তাদের সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। সন্দেহ দূর করতে চায় তারা।

গাড়ি হতে পাঁচ-সাত জন সৈন্য নেমে পড়লো। রাস্তার দুধারের বালুর উপর তারা কিছু খুঁজছে। সম্ভবতঃ পায়ের ছাপ। সতর্কতায় কোন ফাঁক রাখতে চায় না শত্রুপক্ষ। কিছুক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করে সকলে গাড়ির

কাছে ফিরে এলো। পরস্পর আলাপও সেরে নিলো এক ফাঁকে। হঠাৎ অফিসার গোছের একজন নামলো গাড়ি হতে। সে পাহাড়ের দিকে ইশারা করলো। সৈন্যগুলো এবার পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। দম বন্ধ করে, চুপ করে বসে রইল মাসুদ। এই বুঝি সব পরিকল্পনা। পাশে পড়ে থাকা অটোমেটিক মেশিনগানের দিকে নজর ঘুরিয়ে নিলো একবার। দর দর করে ঘাম ঝরছে কপাল হতে। গলাও শুকিয়ে আসছে। জিহ্বা নেড়ে ঠোঁট দু'টি একবার ভিজিয়ে নিলো।

অল্পদূরে উঠে সৈন্যগুলো দাঁড়িয়ে পড়লো। সতর্কতার সাথে মাটি পরীক্ষা করলো। কিছুক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওরা নামতে শুরু করলে একটু হাল্কা হলো মাসুদ। একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক থেকে। সৈন্যরা গাড়িতে উঠে বসলো। ছেড়ে দিলো গাড়ি।

মিনিট দশের পরে শত্রু সৈন্যদের গাড়ি নজরে এলো। প্রথমে দশটি ট্যাঙ্ক সারিবেঁধে এগিয়ে আসছে। তার পিছনে দশ-পনেরোটি সাঁজোয়া গাড়ি। প্রত্যেক গাড়ির পিছনে ভারী কামান ও মর্টার। তার পিছনে রয়েছে কয়েকটি ট্যাংকার। সম্ভবত ওরা বাগলানকে জ্বালিয়ে দিতে চায়। সবার পিছনে দুটি জিপসহ আরো ক'টি গাড়ি। মাসুদ প্রহর গুনছে নীরবে। আর একটু- আর একটু। এক সময় সমস্ত বাহিনীই মুজাহিদদের নাগালের মধ্যে এলো। 'ফায়ার' মাসুদের সংকেত পৌঁছে গেলো সকল দলনেতার কাছে। এক সাথে গর্জে উঠলো অসংখ্য মেশিনগান আর হালকা ও ভারী মর্টার। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেলো। বিকট শব্দে মরুভূমি কেঁপে উঠলো। নিশাচর পাখিরা ডানা ঝাঁপটিয়ে দিক-বিদিক পালাচ্ছে। দূরের আঙুর ক্ষেতে শেয়ালেরা 'হুক্কা হুয়া' রবে ডেকে উঠলো।

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে শত্রু সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়লো। পালাতে শুরু করলো অনেকে; কিন্তু পালানো তাদের ভাগ্যে জুটছে না। মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে কাটা কলাগাছের মত পড়ে যাচ্ছে একের পর এক। কর্নেল আমীন ও ফিলাতপ ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিনা যুদ্ধে এরূপ সৈন্য ক্ষয় হতে দেখে তারা মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিলো। সৈন্যদেরকে সমবেত করে তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করলো; কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পাহাড়ের উপর থেকে মাসুদরা এতক্ষণে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। অল্পক্ষণের মধ্যে আবার ফিলাতপ বাহিনী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কর্ণেল আমীন চুপিসারে ত্রিশ-চল্লিশ জন সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের পিছে সরে এলো এক সময়। একটা সুবিধাজনক স্থানে এসে তারা আক্রমণ শুরু করলো। অতর্কিতে পিছন দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার কারণ খুঁজে পেলোনা মাসুদ। কয়েক সেকেন্ড সে বিমূঢ় হয়ে রইলো। গুলি আসার স্থানগুলো খুঁজে বের করা দরকার। এক সময় পেলও। তার পর মেশিনগান সেদিকে তাক করলো। ইশতিয়াককে সামনের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে সে মেশিনগানের ট্রিগার টিপে ধরে রাখলো। পাহাড়ের শীর্ষে থাকাটা তাদের বাড়তি সুবিধা। পাঁচ-ছ'জন নীচে পড়ে গেলো। মাসুদের দশ হাত দূরে এক বৃদ্ধ মুজাহিদ। বেপরোয়া গুলি ছুঁড়ছেন তিনি। তাকবির ধ্বনি দিয়ে একবার তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁকে ধমক লাগালো মাসুদ। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বললো তারপর তাকে অনুসরণ করে পিছন দিকে গুলি ছুঁড়ার নির্দেশ দিলো।

কর্নেল আমীনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। কৌশলে মাসুদ ও বৃদ্ধ মুজাহিদটি নীচে নেমে এসেছে। একের পর এক গুলি ছুঁড়ছে তারা। কি করবে ভাবছে কর্নেল আমীন। পালানো ছাড়া এখন আর পথ নেই; কিন্তু মাসুদ সে সুযোগ দিলো না।

ঃ হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাও। জীবনের নিরাপত্তা পাবে! গম গম করে বেজে উঠলো মাসুদের কণ্ঠ। পাথরের আড়াল হতে বেরিয়ে এসেছে সে।

হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়লো কমিউনিষ্ট কর্নেল আমীন। ভয়ে তার শরীর কাঁপছে। ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না। হঠাৎ সঙ্গী মুজাহিদটি ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো তাকে। এক ঝাঁক গুলি মাসুদের মাথার উপর দিয়ে শাঁ শাঁ রবে ছুটে গেল। একটুর জন্য বেঁচে গেছে মাসুদ। এক সেকেন্ড দেরি হলে নিশ্চিত মৃত্যু ছিল। মাথা উচিয়ে উঁকি দিলো সে। দেখলো অদূরের পাথরের পাশ হতে একজন রাশান সৈন্য গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে। সঙ্গী মুজাহিদটির স্টেনগান তাকে ঝাঁজরা করে দিয়েছে।

ঃ সামান্যের জন্য আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করেছেন। দৃষ্টি তার কর্নেল আমীনের দিকে।

ঃ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। মাসুদ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলো। একে আপনি সামলান। একজন কর্নেল তিনি। সোভিয়েত চাটুকার আফগান গাদ্দার। কোন চালাকির সুযোগ দিবেন না। আমি ওদিকটায় যাচ্ছি।

পাহাড়ের পিছন হতে সামনে এলো মাসুদ। যুদ্ধ প্রায় শেষ। মুজাহিদরা বন্দি সামলাতে ব্যস্ত। জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই বেশি। জীবিতরাও সকলেই প্রায় আহত। ট্যাঙ্কগুলোতে আগুন জ্বলছে। এন্টিট্যাঙ্ক, মাইন ও ক্ষেপণাস্ত্র গুলো ভালো কাজ দিয়েছে। মাসুদের দু'চোখ ব্যস্তভাবে কাকে যেন খুঁজছে। চেহারায় উদ্বেগ ও ভয়ের ছাপ!

দূরে একটি গাছে নীচে দৃষ্টি গেল তার। সেখানে তিন-চারজন সৈন্য। একজন নেতা গোছের মনে হচ্ছে। তিনি চটপট কিছু করার জন্য সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। মাসুদের বুক কেঁপে উঠলো। তার বুঝতে বাকি রইলো না, কি ঘটতে যাচ্ছে। রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হবে এক্ষুণি। সৈন্যরা মুখে মুখোশ পরছে।

বিলম্ব না করে মাসুদ সে দিকে অগ্রসর হলো। সময় দেয়া ঠিক হবে না। তা হলে সর্বনাশের আর সীমা থাকবে না। পাথরের আড়াল নিয়ে ওদের খুব নিকটে চলে এলো সে। তার পর সুযোগ বুঝে মেশিনগানের ট্রিগারে টিপ দিলো। কিছু বোঝার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো সকলে। গাড়ি হতে একজন রসায়নিক অস্ত্র নামাচ্ছিলো। সে সুযোগ পেয়ে পজিশন নিলো। অন্য গাছের আড়ালে কর্নেল ফিলাতপ। তার হাতে লম্বা নলওয়ালা একটি অস্ত্র। মাসুদ ইতোপূর্বে এমন অস্ত্র দেখেনি। তা হলে কি ওটিই রাসায়নিক অস্ত্র। না জানি ওর ধ্বংসক্রিয়া কত মারাত্মক! এখন কি করা যায়– ভাবতে থাকে মাসুদ। সময় দেয়া ঠিক হবে না। ফিলাতপের পায়ের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। দেরি না করে ফায়ার করলো সে। হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে চিৎকার ছাড়লো ফিলাতপ। অন্য সৈন্যটি মাসুদকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। পাথরে লেগে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। মাসুদ এক দিকে সরে গিয়ে তার মাথা বরাবর গুলি ছুড়লো। অব্যর্থ লক্ষ্য। মৃত্যু গোঙানী দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে।

যুদ্ধ তখন শেষ। বন্দি আটকের কাজও সমাপ্ত। মৃত লাশগুলোকে কি করা যায়-তা নিয়ে ভাবছে মুজাহিদরা। কিন্তু দলনেতা মাসুদকে কোথাও

পাওয়া যাচ্ছে না। চারিদিকে সন্ধান চল্লো। শেষমেশ মৃত লাশের মধ্যেও তাকে খোঁজা হলো; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না। তবে কি তিনি ধরা পড়েছেন! অথবা....

ঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর কোন অকল্যাণ হয়নি– এক মুজাহিদের দৃঢ়কণ্ঠ! আমার সাথে আসুন আপনারা, আমি ও দিকটায় যেতে দেখেছি তাঁকে– যুবককে অনুসরণ করলো পাঁচ-সাতজন মুজাহিদ।

মাথার চুল ধরে ফিলাতপকে বসিয়েছে মাসুদ। হাত নিশপিষ করছে তার। ঠাস ঠাস দুটি চড় বসিয়ে দিলো দু'গালে। ওরে নরাধম! তোকে সহজে মারবো না। তোকে শিক্ষা দিয়ে মারবো। তোর শাস্তি ক্ষমাযোগ্য নয়। পাপিষ্ঠ! তুই রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করতে যাচ্ছিলি। দু'কাধে আধামণি ওজনের দুটি লাথি বসিয়ে দিলো এবার। তাকে ভীষণ হিংস্র দেখাচ্ছে। চোখ দু'টি জবাফুলের ন্যায় লাল। সদাহাস্য কোন যুবকের যে এমন রূপ থাকতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তার এই রূপ দেখে মুজাহিদেরা কথা বলতে সাহস পেলো না। সকলে নীরব দাঁড়িয়ে রইলো। মাসুদ তাদের উপস্থিতি টের পায়নি। বাঘের ন্যায় ফুলছে সে। ফিলাতপের হাড়-মাংস এক-এক করে চিবিয়ে খাবে যেন! অবস্থা বুঝতে পেরে সেই বৃদ্ধ মুজাহিদটি এগিয়ে এলো।

ঃ মাসুদ ভাই! কোন স্নাটকের শেষ হয়েছে। আপ... নিজেকে সামলে নিলো মাসুদ। তারপর শান্ত হয়ে বললো, "আমার সামনে থেকে একে নিয়ে যান।" ফিলাতপকে বেঁধে নিয়ে চলে গেল মুজাহিদরা। মাসুদ পূর্বদিকে দৃষ্টি ফেরালো। দীপ্ত উজ্জ্বল তারাটি অনেক উপরে উঠে এসেছে। অর্থাৎ ভোর হবার দেরি নেই। একটু একটু ফর্সা হচ্ছে পূর্ব আকাশ। তার মনে হলো– তারাটি তার দিকে চেয়ে হাসছে আর বলছে–"স্বাগতম হে দীনের অতন্দ্র প্রহরী।"

ঃ মাসুদ ভাই। চলুন, সকলে অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। গলাটি মাসুদের খুব চেনা মনে হলো। তার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে সে বুঝতে পারেনি। মুখ ফিরিয়ে চাইলো। যুবকটির দিকে। বিস্ময়ে হতবাক সে। মাহবুবুল্লাহ! তুমি! জড়িয়ে ধরলো বুকের মধ্যে। তুমি কেমন আছো মাহবুবুল্লাহ?

ঃ আলহামদু লিল্লাহ! আপনি কেমন মাসুদ ভাই?

ঃ ভালো, খু-উ-ব ভালো। কত দিন পরে তোমার সাথে দেখা হলো। হে খোদা! সব তোমার মহিমা! চলো, অনেক কথা আছে তোমার সাথে।

মাসুদ ফিরে এলো মুজাহিদদের মাঝে। বন্দিদের হাতে-পায়ে বেড়ি পরানো হয়েছে। আহতদের সেবা শুশ্রুষা চলছে। ফিলাতপের পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। সকলকে বাগলানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলো মাসুদ। মাঝে গোলাম রব্বানীর সাথে একবার যোগাযোগ করলো। দলের সাথে ফিরে আসার নির্দেশ দিলো তাকে।

পূর্ব আকাশ এখন অনেক সাদা হয়ে গেছে। একজন আযান দিলো সুমধুর কণ্ঠে। ফযরের নামায হলো জামাতের সাথে। এরপর জানাযা হলো–দশজন মুজাহিদের। গর্ত খুঁড়ে শত্রু সৈন্যদের লাশ ও মুজাহিদদের দাফন কার্য শেষ হলো। ঘড়ি দেখলো মাসুদ। সকাল আটটা এখন।

সকলে ক্লান্ত-শ্রান্ত। চোখ লাল অনেকের। নিদ্রাহীন সারা রাত। পেটে খাবারও পড়েনি। এখন একটু বিশ্রামের দরকার। দরকার একটু ঘুমের।

মাসুদ সকল মুজাহিদকে একত্রিত করে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দিল। তারপর শেষে বললো– আমি জানি আপনারা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। আপনাদের ঘুমের দরকার। দরকার একটু আহারের; কিন্তু তবুও আমি ত্রিশজন মুজাহিদকে চাই। কোথায় কি জন্য ইত্যাদি এখনও বলা হবে না। তবে শুধু এতটুকু বলতে পারি, আজকের এই অভিযানের চাইতে আরো মারাত্মক একটি আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে।

আমি....

কথা শেষ হলোনা মাসুদের। সকল মুজাহিদ হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়লো। সকলের মুখে এক কথা– "আমরা প্রস্তুত।" মাসুদ বিস্মিত হলো! কোথা হতে পেলো তারা এই শক্তি, এই বল! এদের কাছে জীবন থেকে আর্দশ বড়। মৃত্যুকে এরা ভয় করে না! এই না হলে কি মুজাহিদ!

মাসুদ মৃদু হাসলো–! তারপর বললো–

ঃ আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি মাত্র ত্রিশজন লোক চাই। যুবক ও কর্মঠ ত্রিশজন। যাদেরকে এক্ষুণি রওনা হতে হবে আমার সাথে।

এরপর ত্রিশজনকে বেছে নেয়া হলো। বাকিদেরকে বাগলানের মুজাহিদ কমান্ডারের তত্ত্বাবধানে ফিরে যেতে বলা হলো।

ঃ মাসুদ ভাই, আমি?

ঃ অন্য একটি কাজ করতে হবে তোমাকে।

ঃ ফাহিমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

ঃ আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। সকলেই প্রায় বলে, শত্রু সৈন্যের হাতে ধরা পড়েছে আপা! মাথা নীচু হলো মাহবুবুল্লাহর! ওর পিঠে হাত রাখে মাসুদ!

ঃ আশা হারিওনা ভাই! তুমি এক্ষুণি রওনা হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শহরে ঢুকবে। শহরে চলতেও হবে সতর্কতার সাথে। সেখানকার অবস্থা মোটেও ভালো নয়। আমাকে খোঁজা হচ্ছে হন্যে হয়ে।

তুমি নাসিরশাহ সড়কের ২২ নং বাড়িতে গিয়ে একটু খোঁজ নিবে। তোমার একটি ছবি দেখেছি সে বাড়ির ডাইরীতে। দুঃখিত আমি! কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি; কিন্তু সে বাড়িতে যাওয়ার আগে সাদিকের সাথে যোগাযোগ করবে।

ঃ সাদিক– অর্থাৎ সাদিক মাহমুদ!

ঃ হ্যাঁ, সে মাজারেই আছে।

ঃ সাদিক মাহমুদকে পাওয়া গেছে!

ব্যস্ত হয়োনা মাহবুবুল্লাহ! আমার সময় খুব কম।

শেফা হাসপাতালের মালিক ডাঃ আইয়াজ সাহেব। তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমি একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তাকে আমার সালাম জানাবে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাদিকের সাথে দেখা হলে তুমি ফাহিমার সন্ধান পাবে।

এরপর খুব দ্রুত একটি চিটি লিখে ওর হাতে দিলো মাসুদ। সাথে সাদিকের ঠিকানাও বলে দিলো। তারপর ওর পিঠে হাত রেখে বললো–

ঃ যাও মাহবুবুল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

ঃ আপনি এখন কোথায় যাবেন মাসুদ ভাই?

ঃ আপাতত সেটি না শুনাই ভালো!

ঃ কিন্তু আপনার সন্ধান পাবো কোথায়?

ঃ কাল সকালে আইয়াজ সাহেবের নিকট খোঁজ নিও। যাও! রওনা হও, আল্লাহ হাফেজ।

ঃ মাসুদ ভাই!

ঃ ছি! তুমি না মুজাহিদ! বুক উঁচু করে চলবে। ভীরুদের চোখেই কেবল পানি শোভা পায়। যাও! আল্লাহ উত্তম হেফাজতকারী। দীনের অতন্দ্র প্রহরী মুজাহিদ ভায়েরা! চলুন, আমাদের হাতে আর সময় নেই। আপনাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে।

হিন্দুকুশ হতে লোকজন ইতোমধ্যেই সরিয়ে নেয়া হয়েছে। নদীর তীর ধরে গ্রামটি প্রায় তিন কিঃ মিঃ লম্বা। পাখি ডাকা সবুজ গ্রাম। খোলম নদী হিন্দুকুশ এসে বিচিত্র সাজে সেজেছে যেন। দু'ধারে সারি সারি গাছ। প্রশস্ত তীর। নদীটি এখানে এসে সাপের মত এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে। তীর থেকে পাঁচশ মিটার দূরে প্রফেসর আহসান হাবিবের গবেষণাগার। শান্ত পরিবেশে দোতলা একটি ভিলা তৈরী করে দেয়া হয়েছে তাকে। লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছে চতুর্দিকে ঢাকা। একধারে আঙুর ক্ষেত; অন্য ধারে নাশপাতি, আপেল ও কমলার বাগান।

মাসুদ প্রথম এসে দেখা করলো বশির আহমদ সাহেবের সাথে। হিন্দুকুশ রক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর। তিনি নিঃসন্দেহে যোগ্য, বিজ্ঞ ও উপযুক্ত– অল্পক্ষণ আলাপ করে মাসুদ তা স্পষ্ট বুঝতে পারলো।

ঃ আপনাদের ঘাঁটিগুলো কি পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে?

ঃ জি মাসুদ সাহেব! আসুন, ব্যাপারটি আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি ভারমুক্ত হই।

ঃ তা কেন? আপনিই সব কিছু করবেন।

ঃ আমি আপনার সাথেই আছি! এবার দেখুন, সবকিছু ঠিকমত আছে কিনা? কথা শেষ করে বশির আহমদ সাহেব একটি কাগজ এগিয়ে দিলেন। মাসুদ দেখলো তার পাঠানো ছক অনুযায়ীই সবকিছু করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ছক মানা হয়নি।

ঃ আমি দুঃখিত মাসুদ সাহেব! কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার পাঠানো ছক আমি ফলো করিনি; করাটি উচিতও মনে করিনি। গ্রামটির অবস্থান ও

গবেষণাগার সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করেই আমি এমনটি করেছি। সম্পূর্ণ এলাকাটি ঘুরে দেখলে আপনিও হয়ত আমার সাথে একমত হবেন।

ঃ আপনি ঠিক কাজটিই করেছেন। তবুও সমস্ত ঘাঁটি ও এলাকাটি একবার ঘুরে আসা দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় সব অস্ত্র এসে পৌঁছেছে তো?

ঃ আপনার লিস্ট অনুযায়ী সব অস্ত্র আগে থেকেই আমাদের কাছে ছিলো। দু'একটি যা কম ছিলো, ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে।

ঃ কিন্তু রাডার? আগের স্থানেই তো রয়েছে দেখছি। ওরা প্রথমেই রাডার বিকল করতে চায়।

ঃ সে জন্যই এমনটি করেছি। ওটি আসল নয়। আসলটি দু কিলোমিটার পশ্চিমে মরুভূমির সন্নিকটে।

ঃ ওদেরকে ধোঁকা দিতে চান?

ঃ ঠিক ধোঁকা নয়। ওদের আত্মবিশ্বাস জোরদার করতে চাই।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ওরা যদি রাডারটি যথাস্থানে না পায় এবং সেটিকে বিকল করতে সমর্থ হয়েছে– এমনটি নিশ্চিত না হয়, তাদের সন্দেহ হতে পারে।

ঃ অপূর্ব! চলুন এবার ঘাঁটিগুলো একবার দেখে আসি।

ঃ তার আগে অন্য একটি সমস্যার সমাধান করতে হবে। আপনার দায়িত্ব সেটি।

ঃ কি সেটি?

ঃ স্বয়ং প্রফেসর সাহেব!

ঃ তিনি আবার কি করলেন?

ঃ তাঁকে গবেষণার হতে সরানো সম্ভব হয়নি।

ঃ কেন?

ঃ তিনি গোঁ ধরেছেন– ওখান থেকে কোথাও যাবেন না।

ঃ সাময়িকভাবে তাঁকে সরানো হচ্ছে তো!

ঃ তিনি তা বুঝতে চাইছেন না।

ঃ আসল ব্যাপারটি কি তাঁকে বলা হয়েছে?

ঃ না! তবে কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

ঃ তবুও যেতে রাজি হননি?

ঃ না! তাঁর এক কথা- আমাকে বিরক্ত করো না। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ে উপস্থিত হয়েছি আমি।

ঃ চলুন, দেখি কি করা যায়?

ঃ কেউ গেলে তিনি খুব বিরক্ত হচ্ছেন।

বিজ্ঞানী আহসান হাবীব। মনোযোগ দিয়ে কিছু পরীক্ষা করছেন। কাঁচের দরজায় মৃদু নক করলো মাসুদ। একবার, দু'বার। কোন সাড়া নেই। তৃতীয়বার নক করতেই আওয়াজ এলো –কে?

ঃ আমি মাসুদ স্যার!

ঃ কি চাই?

ঃ আপনার সাথে দেখা করবো স্যার।

ঃ তুমি এখন আসতে পারো। কোন মাসুদকে আমি চিনি না।

ঃ স্যার! আপনি আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিলে আপনাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। কথা শুনে প্রফেসর সাহেব মাথা তুললেন। চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন তিনি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফিক্ করে হেসে দিলেন।

ঃ তুমি কোথা থেকে মাসুদ? কেমন আছো? এসো এসো, ভেতরে এসো।

ভেতরে গিয়ে বসলো মাসুদ। সাথে বশির আহমদ সাহেব।

ঃ বলো দেখি মাসুদ! মেজর আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।

ঃ আমিও তো সেজন্য এসেছি স্যার।

ঃ তুমিও সেজন্য এসেছো?

ঃ হ্যাঁ স্যার!

ঃ দাঁড়াও দাঁড়াও কি ব্যাপার বলো তো? এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছো কেনো আমাকে সরাতে?

ঃ আপনার নিরাপত্তার জন্য স্যার।

ঃ আমার নিরাপত্তা?

ঃ শুধু আপনার নয়, আগানিস্তানের গোটা মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য!

ঃ গোটা মুসলিম বিশ্বের?

ঃ জি স্যার।

ঃ ব্যাপারটি কি, একটু খুলে বলবে?

ঃ আপনাকে রাশিয়ায় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

ঃ কেন?

ঃ আপনি যে অস্ত্র ও শক্তিশালী লেসার গান আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন, রাশিয়া চাচ্ছে সেটির মালিক তারা হোক। সেজন্যই আপনাকে তারা সশরীরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চায়!

ঃ তোমরা কি শিওর?

ঃ জি। আগামী চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তারা অপারেশন শুরু করবে।

ঃ কিন্তু তোমরা?

ঃ তাদের সে অপারেশন ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। কিন্তু তবুও নিরাপত্তার জন্য আপনাকে অন্তত আজকের জন্য অন্যত্র থাকতে হবে।

ঃ ঠিক আছে। চলো দেখি কোথায় নিয়ে যাবে।

গবেষণাগার হতে ওরা বেরিয়ে পড়লো ধীর পায়ে।

মাহবুবুল্লাহ অনেক কষ্টে মাজারে প্রবেশ করলো। সেখানকার অবস্থা মোটেও ভালো নয়। ধরপাকড় চলছে যত্র-তত্র। হন্যে হয়ে তারা মাসুদকে খুঁজছে। বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চলছে। সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। গত কালকের হামলায় গোয়েন্দা বিভাগের তিনতলা ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। দাভিস্কাসহ আরো অনেক কর্মকর্তা মারা গেছে। মাজারবাসীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেলেও একটা গোপন ভয় তাদের মধ্যে বিরাজ করছে। মুখে মুখে বীর মুজাহিদ মাসুদের নাম ছাড়িয়ে পড়েছে। একটু সুযোগ পেলেই তারা মাসুদের বীরত্ব কাহিনী নিয়ে আলোচনা করছে। এক গীতিকার তাঁর বীরত্ব কাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যেই গান রচনা করে ফেলেছেন।

'শেফা' হাসপাতালের সামনে এসে নামলো মাহবুবুল্লাহ। ক্লান্ত শরীর। দু'চোখ কিঞ্চিৎ লাল। একটু ঘুমাতে পারলে ভালো হতো, পেটে ক্ষুধা। কিন্তু কিছু খেতে ভালো লাগছে না।

হাসপাতালের চারপাশটা ভালো করে একবার দেখে নিলো সে। রোগী আসছে-যাচ্ছে। সাথে তাদের আপনজন। এক অল্প বয়সী ছেলেকে সাবধানে নামানো হচ্ছে। তার একটি পা কেটে ফেলা হয়েছে। ছেলেটির মা কাঁদছে নীরবে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছাচ্ছে মাঝে মধ্যে। মাকে ছেলেটি নিজে দু'বার চোখ মুছে দিলো। দৃশ্যটি করুণ। মাহবুবুল্লাহ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো। জানতে চাইলো কি হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে মা যা বললেন তা এরূপ– খেলা করছিলো তার ছেলে। সাথে আরো বাচ্চা ছিলো। এমন সময় হেলিকপ্টার হতে আকর্ষণীয় খেলনা ফেলা হয়। আসলে ওগুলো খেলনা ছিলো না। ছিলো খেলনার মোড়কে এক প্রকার। তার একটিতে ছেলের এক পা উড়ে গেছে। তাদের বাড়ি এখান হতে তিন ক্রোশ দূরে এক গ্রামে।

মনটা খারাপ হয়ে গেলো মাহবুবুল্লাহ্‌র। চোখে এক ঝলক আগুনের ফুলকি দেখা গেলো। হাত দু'টি অজান্তে মুষ্টিবদ্ধ হলো। আফগান শিশুদের পঙ্গু করার কি হীন ষড়যন্ত্রই না করছে বর্বর নাস্তিক বাহিনী।

হাসপাতালে প্রবেশ করলো মাহবুবুল্লাহ। পরিষ্কার ও পরিপাটি চতুর্দিক। শান্ত পরিবেশ। রিসিপশনিস্টকে সালাম দিলো সে।

ঃ ওয়াআলাই কুমুস্‌সালাম। আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন? বললেন রিসিপশনিস্ট মধ্য বয়সী ভদ্রলোক! কথাগুলো ভীষণ মিষ্টি!

ঃ ডাক্তার সাহেব আছেন?

ঃ আপনার কি কোন পেশেন্ট আছে?

ঃ জি-না।

ঃ আপনি নিজেই পেশেন্ট?

ঃ না।

ঃ তাহলে?

ঃ আমি উনার সাথে দেখা করতে চাই।

ঃ এখানে তো অনেক ডাক্তার। পাঁচ সাতজন। আপনি কার সাথে দেখা করতে চান?

ঃ হাসপাতালের যিনি মালিক। ডাঃ আইয়াজ সাহেবের সাথে।

ঃ আপনি কোথা হতে আসছেন?

ঃ অনেক দূর থেকে। লোকটি এবার মাহবুবুল্লাহকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো। খুব তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদি সে দৃষ্টি। মাহবুবুল্লাহ শান্ত। তার কোন ভাবান্তর নেই।

ঃ আপনার নাম?

ঃ মাহবুবুল্লাহ।

ঃ প্লিজ! আপনি বসুন। লোকটি ভেতরে চলে গেলো এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলো! তারপর বললো-যান। সোজা গিয়ে বাম পাশের রুম।

ঃ ধন্যবাদ।

আইয়াজ সাহেব একটি এক্স-রে দেখছিলেন। মাহবুবুল্লাহ সালাম দিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

উত্তর দিয়ে মুখ তুলে চাইলেন আইয়াজ সাহেব।

ঃ আমার নাম মাহবুবুল্লাহ। হাত এগিয়ে দিলো হ্যান্ডসেকের জন্য।

ঃ বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?

ঃ আমি বাগলান থেকে আসছি। সে কিছু নিরাপত্তা কোডও বর্ণনা করল।

কথা শুনে তাকে তীক্ষ্ণভাবে দেখলেন তিনি। তারপর বেল টিপলেন কেয়ারটেকার ছুটে এলো।

ঃ আমি না ডাকা পর্যন্ত কেউ যেন রুমে প্রবেশ না করে।

ঃ জি স্যার।

ঃ তোমরাও আসবে না।

ঃ জি স্যার! চলে গেলো সে।

ঃ বলুন সেখানকার খবর কি?

ঃ আলহামদুলিল্লাহ! একটি শত্রু-সৈন্যও ফিরে যেতে পারেনি। কর্নেল আমীন ও ফিলাতভ দু'জনকেই বন্দি করা হয়েছে।

ঃ আমাদের দিকে হতাহত?

ঃ দশজন শহীদ হয়েছেন। আর আহত হয়েছেন জনা বিশেক। ডাঃ সাহেবের চোখ ভারী হয়ে এলো। অশ্রু চিক চিক করছে চোখের কোণায়। একসময় তিনি দোয়া করতে থাকলেন আল্লাহ! সকল মুজাহিদকে তুমি গায়েবী মদদ করো! মনে মনে আমীন বললো মাহবুবুল্লাহ।

ঃ বলুন, মাসুদ সাহেব কেমন আছেন?

ঃ তিনি ভালো আছেন। একটি চিঠি দিয়েছেন আপনাকে, এই নিন। চিঠি পড়তে পড়তে দু'বার মাহবুবুল্লাহকে দেখে নিলেন তিনি। মুখ মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর। মনে হচ্ছে একটি দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন যেন। এর উদাহরণ দেয়া যায় হাল্কা মেঘের আড়ালে সূর্য উঁকি দেয়ার মত। চিঠি পড়া শেষ করে তিনি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বেল টিপলেন। কেয়ারটেকার দরজা খুলে উঁকি দিলো।

ঃ সাত নম্বর রুমের পেশেন্টের কি অবস্থা দেখে এসো। –মাহবুবুল্লাহ সাহেব! এখন আপনার রেস্ট, আহার ও ঘুমের দরকার, কি, ঠিক না? হাসছেন তিনি। মাহবুবুল্লাহ বুঝলো না এর মধ্যে হাসির কি ঘটলো।

ঃ জি। আমার ক্ষুধা পেয়েছে। একটু ঘুমেরও দরকার । তার আগে সাদিক মাহমুদের ঠিকানায় আমাকে একটু পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন।

ঃ সেটির আর দরকার হবে না। আপনি তো আমার মেহমান!

ঃ কিন্তু আমি এসেছি অন্য একটি কাজে!

ঃ জানি।

ঃ আপনি জানেন?

–দরজার ফাঁকে আবার কেয়ার টেকারের মাথা দেখা গেলো। স্যার, তিনি জেগে আছেন, কিন্তু কাঁদছেন।

ঃ ঠিক আছে! তুমি যাও! চলুন মাহবুবুল্লাহ সাহেব! আমরা একটা পেশেন্ট দেখে আসি!

ঃ কিন্তু আমি..।

ঃ চলুন না! একজন মানসিক রোগী। আমার ধারণা আপনাকে দেখলে সে ভালো হয়ে যাবে!

ঃ ডাক্তার সাহেব! দেখুন.....

ঃ আরে ভয় পাবার কি আছে! আমি তো সাথে থাকছি। তবে আমার সাথে রুমে ঢুকবেন না। আমি ডাকলে তবে ঢুকবেন।

ঃ আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঃ দেখুন, অনেক রোগ ঔষধে সারে না। আপনার এতোটুকু করাতে যদি একটি রোগী ভালো হয়-আপনি করবেন না কেন?

ঃ আচ্ছা চলুন।

ওরা সাত নম্বর কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ালো। নক করে ভেতরে মাথা ঢুকালেন ডাক্তার সাহেব।

ঃ আসতে পারি।

ঃ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সম্মতি জানালো ফাহিমা।

ঃ কেমন আছেন? উত্তর দিলো না সে।– মিছেমিছি কাঁদছেন আপনি।

ঃ আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ডাক্তার সাহেব।

ঃ সব ঠিক হয়ে যাবে এক্ষুণি। এইমাত্র সংবাদ পেলাম, তিনি ভালো আছেন। বাবা! কালরাতে কি একটা কাণ্ড করলেন। লজ্জা পেলো ফাহিমা। সাদিক ছেলেটি খুব কাজের। ঠিক সময়েই নিয়ে এসেছিলো আপনাকে।

ঃ ডাঃ সাহেব, আপনি অনেক কথা আমা... নার্স ঢুকলো ভেতরে। স্যার, উনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।

ঃ ঔষধের আর দরকার নেই। বাইরে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। নার্স বের হয়ে গেলো। মাহবুবুল্লাহ ভেতরে ঢুকলো।

ঃ আপা!!

ঃ মাহবুবু! ভাই আমার!! খাট থেকে নীচে নেমে এলো ফাহিমা। ওর মাথায় হাত দিয়ে কাছে টেনে নিলো। কপালে চুমু খেলো। দুচোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ফাহিমার। তার একমাত্র আপনজন আদরের ছোট ভাই, মাহবুব তার সামনে দাঁড়িয়ে। গণ্ড বেয়ে ঝরঝরিয়ে অশ্রু পড়ছে ফাহিমার। মাহবুবুল্লাহর দু'চোখও অশ্রুতে ভরে উঠলো। ডাক্তার সাহেব মুখ ঘুরালেন অন্য দিকে।

–তুই কোথা ছিলি ভাই। দুনিয়াতে তুই ছাড়া আর কেউ নেই আমার।

ঃ আপা!!

ঃ আয় আয় আমার পাশে বোস। ডাক্তার সাহেব, একে আপনি কোথা থেকে ধরে আনলেন?

ঃ আমি আনিনি। মাসুদ সাহেব পাঠিয়েছেন। তিনি ভালো আছেন।

ঃ আমার খবর কি সে জানতে পেরেছে?

ঃ না।

–ফাহিমা! আমি এসে গেছি। পারভীন প্রবেশ করলো ভেতরে। হাতে টিফিন ক্যারিয়ার। দুপুরের খাবার তাতে। প্রবেশ করেই সে অপ্রস্তুত হলো। লজ্জা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ঃ আয় পারভীন, আয়! দেখ কে এসেছে! মাহবুব, আমার ছোট ভাই। মাহবুব আস্তে করে সালাম দিলো পারভীনকে। ডাক্তার সাহেব! আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি আজই বাড়ি যেতে চাই।

ঃ আপনি ভালো হয়ে গেছেন, ঠিক। তবে বাড়ি যেতে পারবেন না। দু'ভাই বোন এখানেই থাকবেন আজ। অন্তত মাববুবুল্লাহ সাহেবের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। ঠিক আছে, আপনারা কথা বলুন। আমি পরে আসবোক্ষণ। চলে গেলেন ডাক্তার সাহেব।

কাবুলের কে.জি.বি হেড কোয়ার্টার। সভা কক্ষের মুল আসনে বসে আছেন আন্দ্রোভিস্ক। দুঠোঁটের মাঝে চুরুট জোরে জোরে টানছেন তিনি। খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। কপালের বাম পাশটা মাঝে মধ্যে লাফাচ্ছে। বেশি চিন্তা করলে এমন হয়। সভাকক্ষের প্রায় সকল আসনই খালি। আফগানিস্তানে রুশ বাহিনী প্রধানসহ চারজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও তিনজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বসে আছে চুপ করে।

চল্লিশ বছরের গোয়েন্দা জীবনে আজকের মত চিন্তিত তিনি কোনদিন হননি। মাসুদ নামের বাংলাদেশী যুবকের বীরগাথা শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। গত দু'সপ্তাহ ধরে গোয়েন্দা বাহিনীকে ঘোল খাইয়ে চলেছে সে। আজ সকালে যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুরণের নয়। বাছাই করা এক হাজার সৈন্য শেষ হয়েছে। শেষ হয়েছে অনেক গোলা বারুদ। পঁচিশটি রাসায়নিক অস্ত্র হাতছাড়া হয়েছে। কর্নেল আমীন ও কর্নেল ফিলাতভ বন্দি হয়েছে-- কিন্তু কি করে সে যুবক এসব অসাধ্য সাধন করছে।

ঃ স্যার, ফাইলটি। এই চিন্তার তার ছিঁড়ে গেলো আন্দ্রোভিস্কার। পিএ এসে টেবিলে একটি ফাইল রাখলো। একটু নড়ে চড়ে বসে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। গম্ভীর গলা। আপনারা জানেন গত দুসপ্তাহ ধরে সর্বত্র আমরা মার খাচ্ছি। প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। গতকাল যে ক্ষতি হয়েছে তা অবর্ণনীয়। এক হাজার বাছাই করা সৈন্য হারিয়েছি আমরা। বাগলান পূনর্দখলের স্বপ্ন আমাদের চুরমার হয়ে গেছে। বলা যায় মাজার এখন

হাতছাড়া আমাদের। সেখান থেকে বাকি সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়াই বাঞ্ছনীয় বোধ করি এ মুহূর্তে। কিন্তু কেন আমাদের এই পরাজয়? আমাদের সকল পরিকল্পনা ও গোপন তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করেছে মুজাহিদরা। সম্ভবত এ সবের পেছনেই রয়েছে বাংলাদেশী ওই যুবকের হাত। যাই হোক-এ পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই আমাদের নিতে হবে।

ঃ সেটি হবে। আফগানের সামরিক প্রধান বলতে থাকেন। আমি আরো একশ জনের কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা যেমন দুর্ধর্ষ তেমন ভয়ংকর। যে কোন অসাধ্য সাধন তাদের দ্বারা সম্ভব।

ঃ আমরা চিরদিন আফগানিস্তানে থাকবো না। তাই আমাদের সৈন্য হত্যার প্রতিশোধ আমরা আফগানদের হত্যা করে নিবো। অপারেশন শেষ হলে আশপাশের সকল এলাকা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। আমাদের দরকার প্রফেসর আহসান ও তাঁর ফরমূলা এবং গবেষণা ফলাফল।

ঃ সেটিই হবে। কমাণ্ডো বাহিনীকে সেভাবেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ঃ আর একটি জিনিস।

ঃ কি স্যার? অন্য একজন সামরিক কর্মকর্তা জানতে চায়।

ঃ আফগান সরকারি বাহিনীর সদস্যদের উপর এখন থেকে কড়া নজর রাখতে হবে। যতদূর বিশ্বাস আমার তাদের দ্বারাই আমাদের গোপন প্লান মুজাহিদদের হস্তগত হচ্ছে।

ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। সেনাপতি বলতে থাকেন– আর মাসুদ নামের ওই যুবককে পাকড়াও করার জন্য আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের সকল এজেন্টকে নির্দেশ দেয়া হোক। এ ব্যাপারে সকল স্টেশনে নির্দেশনা পাঠানো হোক।

ঃ হ্যাঁ, সে ব্যবস্থাই করা হয়েছে। তাহলে এ পর্যন্তই। সুখবর শোনার অপেক্ষায় রইলাম। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

মাসুদকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছে। কপালে চিন্তার রেখা। স্থির হয়ে বসতে পারছে না। ঘড়ি দেখলো একবার। বিকাল চারটা। অর্থাৎ আগামী দুঘণ্টার মধ্যে যে কোন সময় তারা আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু ওদের সে

আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হবে তো? ভাবতে থাকে মাসুদ। পূর্বের পরিকল্পনার চেয়ে নিশ্চয়ই তারা আরো বেশি শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আজ সকালের চরম পরাজয় ও ব্যর্থতার প্রতিশোধ তারা কড়ায়-গণ্ডায় নিয়ে নেবে। তাছাড়া ক্ষতিও তো কম-সম নয়।

ঃ মাসুদ সাহেব! আপনি এখানে, আর আমি খুঁজে মরছি অন্যখানে। বশির আহমদ সাহেবের কথায় চিন্তায় ছেদ পড়ে মাসুদের।

ঃ আসুন বশির সাহেব।

ঃ এখনতো বসলে চলবে না। হাতে সময় আছে কিছু। চলুন, সব ক'টি ঘাঁটি আরো একবার ঘুরে করে আসি।

ঃ আচ্ছা বশির সাহেব।

ঃ বলুন।

ঃ আপনার কি মনে হয়- ওরা আজকের প্লান বাদ দিবে?

ঃ গতকালকের ক্ষতির পরিমাণ চিন্তা করে মনে হয় বাদও দিতে পারে।

ঃ না, বাদ দিবে না। আরো বেশি শক্তি নিয়ে ওরা আজ আক্রমণ করবে। ওদের আজকের হিংস্রতা হবে খুবই ভয়াবহ।

ঃ সে সুযোগ ওদের দেয়া যাবে না। প্রতিরোধ করার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের।

ঃ বশির সাহেব। ব্যবস্থা অস্ত্র বলের গর্ব করতে নেই। মুসলমানদের কাছে অস্ত্র বলের থেকে বড় বল ঈমান। রাশিয়ার সৈন্যদের অস্ত্র বল ও কলা-কৌশল আমাদের থেকে অনেক বেশি।

ঃ আমি দুঃখিত মাসুদ সাহেব। আমি ঠিক অমনটি বোঝাতে চাইনি।

ঃ চলুন দেখি, শেষ তদারকিটা সেরে আসি।

দুটি জীপে করে ওরা ঘাঁটিগুলো একবার ঘুরে এলো। না, কোথাও কোন ত্রুটি নেই। নিখুঁতভাবেই মুজাহিদদের সন্নিবেশ করা হয়েছে। যে কোন আক্রমণ এমন দুঃসাহসী মুজাহিদ দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব। কিন্তু তবুও মাসুদ স্বস্তি পাচ্ছে না। তারা প্রতিরোধে ব্যর্থ হলেও ক্ষতি নেই। প্রফেসর সাহেবকে ওরা পাবে না। পাবেনা তাঁর ফর্মূলাও। তখন হয়ত সমস্ত গ্রামটি তারা নিশ্চিহ্ন করে দিবে। আশপাশের গ্রামগুলো ধ্বংস করাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু সেটিও কি কম ক্ষতি। হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ মারা যাবে। পঙ্গু ও অন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করবে অসংখ্য ছেলে-মেয়ে। ওদের বিশ্বাস কি। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের জন্য ওরা সব কিছুই করতে পারে।

পাঁচের ঘর পেরিয়ে গেছে ঘড়ি। সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই আর। তবে কি ওরা সত্যিই প্লান বাদ দিয়েছে, না রাত্রে আক্রমণ করতে চায়? নামাযের সময় সবাই একবারে নামায পড়বে না। সব ঘাঁটিতে নির্দেশ পাঠালো মাসুদ। সময়ের সাথে সাথে তার উদ্বেগও বাড়ছে। যদি নামাযের সময় আক্রমণ হয়।

সমস্ত গ্রামটাকে মৃতপুরী মনে হচ্ছে। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। গাছে পাখিদের কলকাকলী থেমে গেছে। ইতোমধ্যেই উত্তরে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। মাসুদ বসে আছে রাডারের সামনে। হাতে অয়্যারলেস। স্ট্রিংগার ও বিমান বিধ্বংসি কামান পরিচালনার দায়িত্বে বশির সাহেব। মিনিটের কাঁটা দশের ঘর পার হলো এক সময়। মাসুদের পলকহীন দৃষ্টি রাডারের স্ক্রিনে শত্রু বিমান দেখতে পেলো। সাথে সাথে সব ঘাঁটিতে সংকেত পাঠালো মাসুদ। কিন্তু কি আশ্চর্য। পলকের মধ্যে কিছু বুঝে উঠার আগেই কৃত্রিম রাডারটি ধ্বংস করে দিলো দু'টি বিমান। এরপর পরই চোখের পলকে কোথা হতে দশটি বিমান ও পনেরটি অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার উড়ে এলো। শুরু হলো বোমা বর্ষণ। নামিয়ে দেয়া হচ্ছে প্যারাসুট বাহিনী। মাসুদের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে গর্জে উঠলো বিমান বিধ্বংসী কামান ও স্ট্রিংগার। একের পর এক ডিগবাজি খেয়ে নীচে পড়তে লাগলো বিমান ও হেলিকপ্টার। এসবে আগুন ধরে যাওয়াতে এলাকাটি ধোঁয়ায় ছেয়ে গেলো। যে সৈন্যগুলো প্যারাসুট নিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিচ্ছিলো, তারা মাটিতে পড়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

ঃ বশির সাহেব। চিৎকার ছাড়লো মাসুদ। দক্ষিণ দিকে ওই যে বিমানটি এর উদ্দেশ্য ভালো নয়। এক্ষুণি সে গবেষণাগার ধ্বংস করে দিবে। ওটিকে আগে ঘায়েল করুন।

ঃ এক্ষুণি করছি। আপনি চিন্তা করবেন না। কথা শেষ করে নিজেই স্ট্রিংগার ছুড়লেন বশির আহমদ সাহেব। বিমানের একটি ডানা ভেঙ্গে গেলো। তারপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। পাইলট প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ

দিলো শূন্যে। বিমানটি গিয়ে পড়লো নদীর বুকে। আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার দিলো মাসুদ। সাথে সাথে অন্য মুজাহিদরাও তার অনুসরণ করলো। বাতাসের তরঙ্গে মিশে সে তাকবির ধ্বনি দিগবিদিক ছড়িয়ে পড়লো।

মাসুদের পাঁচ মিটার দূরে হেভী মেশিনগান নিয়ে বসে ছিলো এক যুবক। হঠাৎ সে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এক ঝাঁক বুলেট এসে তাকে বিদ্ধ মাসুদ ক্ষিপ্রগতিতে একটি পাথরের আড়ালে সরে গেলো। সন্ধানী দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো পিছন দিকে। গুলি আসার উৎস তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। হঠাৎ একটি মেশিনগানের নল তার নজরে এলো। নলটি ধীরে ধীরে পাথর আড়াল করে এগিয়ে আসছে। ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ভাবলো মাসুদ। ওকে সময় দেয়াও ঠিক হবে না। পিছনে আরো শত্রু থাকতে পারে। একটি গ্রেনেডের চাবি খুলে পাথরের পিছন দিক ছুড়ে দিলো আস্তে করে। কানফাটা শব্দে বিস্ফোরণ হলো। শত্রুর ছিন্ন মাথা এসে মৃত মুজাহিদটির পায়ের উপর পড়লো। মাসুদ আরো একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করলো।

দূর আকাশে দু'টি বিমান চক্কর দিচ্ছে। তাদের হাব-ভাব ভালো মনে হচ্ছে না। এক্ষুণি তারা বোমা বর্ষণ করবে। মুজাহিদদের উত্তর দিকের ঘাঁটি হতে বিমান বিধ্বংসী কামান গর্জে উঠলো। কিন্তু না বিমান দু'টির কোন ক্ষতি হলো না। তারা পজিশন নিয়ে তীর গতিতে এগিয়ে আসছে। গবেষণাগারটি ধ্বংস করতে চায় তারা। মাসুদ ক্ষিপ্রগতিতে সরে গেলো স্টিংগারের কাছে। রেঞ্জের মধ্যে আসতেই সে ছুঁড়ে দিলো স্টিংগার, একটি বিমানে আগুন ধরে গেলো। সরাসরি আঘাত হেনেছে ক্ষেপণাস্ত্রটি। দ্বিতীয়টি লক্ষ্য করে আরো একটি ছুঁড়লো সে। এক ঝলক আগুনের ফুলকি পিছন দিকে ফেলে রেখে সামনে এগিয়ে গেলো গোলা। পিছনের পাখায় গিয়ে আঘাত করলো গোলাটি। বিমান কাত হয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলো যে কোন মুহূর্তে আগুন ধরে যাবে। চারদিক হতে মুজাহিদদের তাকবির ধ্বনি ভেসে এলো। কিন্তু ততক্ষণে মাসুদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। তার বাম হাতটি ভেঙে গেছে। বিমান থেকে ছুঁড়া মেশিনগানের গুলি তার বাম হাতের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে।

ঃ মাসুদ সাহেব। আপনি ঠিক আছেন? বশির সাহেবের ব্যাকুল কণ্ঠ।

ঃ আমার জন্য ভাববেন না, আপনি ওদিকটায় ভালো করে দেখুন– কোন শত্রু সৈন্য আছে কিনা।

ঃ ওদিকে দেখার যথেষ্ট লোক রয়েছে– শত্রু সৈন্য ঘায়েল হয়েছে। কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসেন বশির সাহেব। মাসুদ ডান হাতদিয়ে বাম হাত চেপে ধরে যন্ত্রণা দূর করার চেষ্টা করছে। কনুইয়ের নীচ হতে বাম হাতটি ঝুলে পড়েছে।

ঃ একি। আপনার বাম হাত তো ভেঙে গেছে। এক্ষুণি রক্ত বন্ধ করতে হবে।

ঃ দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনি দেখুন ওদিকটা।

ঃ শত্রু সৈন্য সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে। আমাদের তেমন ক্ষতি হয়নি। মাত্র তিনটি বিমান ও পাঁচটি হেলিকপ্টার প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে।

ঃ কোন শত্রু সৈন্য বন্দি হয়নি?

ঃ জনা পনেরো হবে। আপনাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আগে উঠুন দেখি, এক্ষুণি প্লাসটার করতে হবে।

ঃ আরো কোন মুজাহিদ আহত হয়েছে কি-না দেখুন, আমি ভালো আছি। হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করলো মাসুদ। যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

মাসুদ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। পশ্চিম আকাশ রঙিন আভায় নেয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা তারাটিও ফুটে উঠেছে দক্ষিণ দিক হেলে। মাসুদ সেদিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। অজান্তে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক হতে। ঠিক সে সময় মধুর কণ্ঠে ভেসে এলো আজানের ধ্বনি–

আল্লাহ মহান

আল্লাহ মহান

এসো নামাযের দিকে

এসো কল্যাণের দিকে-

মাসুদের যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো। আস্তে আস্তে বল্লো–

আল্লাহ তুমি মহান

অপার তোমার কৃপা।

পরদিন বিকাল বেলা। গবেষণাগারের সামনের ফাঁকা স্থানে একা বসেছিলো মাসুদ। সামনে শান্ত খোলম নদী। মৃদু-ছন্দে বয়ে যাচ্ছে। ঝিরি ঝিরি বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস। নদীর শান্ত পানিতে দু একটি পাতা পড়ছে। কিনারে ছোট মাছেরা খেলা করছে। একটি মাছরাঙা চুপ করে বসেছিলো। হঠাৎ সে পানিতে ঠোঁট লাগালো। দুসেকেন্ড পর ঠোঁটে একটি মাছ নিয়ে ডালে গিয়ে বসে সে খেতে লাগলো মাছটি।

মাসুদের ভীষণ ভালো লাগছিলো এই পরিবেশ। সবুজ শ্যামল গাছগুলো জড়াজড়ি করে কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দুরে ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। তাদের কল-কাকলি ভেসে আসছে কানে। কত মিষ্টি বাচ্চাদের এই নিষ্পাপ পদচারণা, খেলা, কল-কাকলি। অথচ বর্বর শত্রু বাহিনী তাদের এই নির্মল আনন্দ কেড়ে নিতে চেয়েছিলো।

কত তফাৎ কালকের আর আজকের বিকেলের মধ্যে। মাসুদ ভাবতে থাকে। কাল এখানে চলছিলো মৃত্যুর আলোজন। আজরাঈলের হাতছানি ছিলো চতুর্দিকে। অথচ আজ ঠিক সেই সময় জান্নাতি হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সেখানে। নিষ্পাপ বাচ্চাদের সাথে যেন ফেরেশতারা খেলা করছে।

একটু নড়ে বসলো মাসুদ। হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে। ক্লান্তিতে শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে। ক'দিন বেশ করে বিশ্রাম নেয়া দরকার। ধকলতো কম গেলো না। আব্বা আম্মাকেও চিঠি লেখা হয়নি। তাঁরা এখন কেমন আছেন। শেষ চিঠিতে আম্মা ফাহিমার কথা জানতে চেয়েছিলেন। আচ্ছা, ফাহিমা এখন কোথায়? সে কি বেঁচে আছে? থাকলে কেমন আছে? সাদিক ও মাহবুবুল্লাহ কি তাকে খুঁজে পেয়েছে? ওদের সাথে একবার দেখা হওয়া দরকার। যদি তারা সন্ধান না পায় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো মাসুদের। মনে মনে বল্লো- তুমি যেখানেই থাকো, ভালো থেকো ফাহিমা। ভালো থেকো।

ঃ কি ভাবছো- প্রফেসর সাহেব কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি মাসুদ।

ঃ স্যার। ভাবছি কাল ও আজকের মধ্যে কত তফাৎ।

ঃ হ্যাঁ, সময়ের ঘূর্ণায়মান চাকার এক দিকে যেমন আনন্দ অন্য দিকে তেমন থাকে বিষাদ।

ঃ আগের চেয়ে আরো অনেক বেশী নিরাপত্তার দরকার আপনার, স্যার।

ঃ হ্যাঁ। ওরা একবার যখন সন্ধান পেয়েছে- সহজে ছাড়বে না। ব্যর্থ হলে আমাকে শেষ করে দিবে। এই জন্য আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সব কিছু শেষ করতে চাই।

একটি নতুন গবেষণাগার তৈরি করতে হবে আপনার জন্য।

ঃ কিন্তু জায়গাটি বড় ভালো ছিলো মাসুদ, কেমন মায়া পড়ে গেছে।

ঃ হ্যাঁ, অপূর্ব জায়গা। আমার মনে হচ্ছে– মৃত্যু পর্যন্ত যদি এ জায়গাটিতেই থাকতে পারতাম।

কথার মাঝে কখন একটি নৌকা তীরে ভিড়েছে খেয়াল করেনি কেউ পাহারত একজন মুজাহিদ মাঝির সাথে কথা বলছে। যতদূর মনে হচ্ছে সে তাদেরকে এখানে নৌকা ভেড়াতে নিষেধ করছে। কিন্তু তারা সেটি শুনতে চাচ্ছে না।

ঃ কি হয়েছে ভাই? প্রফেসার সাহেব উচ্চৈঃস্বরে জানতে চাইলেন।

ঃ স্যার, এরা এখানে নামতে চায়। আমি সামনের ঘাটে গিয়ে ভিড়তে বলছি। কিন্তু এরা শুনছে না।

ঃ কি চায় তারা?

ঃ আপনাদের সাথে দেখা করতে চায়।

ঃ ঠিক আছে। আসতে দাও, তুমি সাথে এসো।

ঃ জি স্যার।

মাসুদ চেয়ে আছে বিস্ময়ে- কারা নামছে নৌকা হতে। মাহবুবুল্লাহ, সাদিক মাহমুদ ও দু'জন মহিলা। আপাদ-মস্তক ঢাকা তাদের, তবে কি ওরা ফাহিমার সন্ধান পেয়েছে?

সাদিক ছুটে এসে মাসুদকে জড়িয়ে ধরলো। ভাইয়া। আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। আনন্দে কাঁদছে সে। মাহবুবুল্লাহও ধীর পায়ে পাশে এসে দাঁড়ালো। তার চোখেও আনন্দ অশ্রু।

ঃ মাসুদ দেখো কাকে সাথে করে এসেছি। পারভীনের আম্মা ফাহিমাকে নিয়ে এগিয়ে এলেন। ফাহিমা আস্তে করে সালাম দিলো। তারপর জানতে চাইলো–

ঃ কেমন আছো?

ঃ ভালো। তুমি?

ঃ হাতে কি হয়েছে?

ঃ ভেঙে গেছে। গুলি লেগেছিলো।

ঃ বাবা মাসুদ। মহিলা এগিয়ে এলেন। আমি এসেছি তোমাকে দোয়া করতে?

ঃ আপনাদের মত মার দোয়াইতো আমাদের পাথেয়।

ঃ আল্লাহ তোমাকে সকল প্রকার বিপদ হতে হেফাজত রাখুন।

ঃ আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। মাসুদও দোয়া করলো। প্রফেসর সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলেন আর অভিভূত হচ্ছিলেন। তিনি গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে কিছু বলতে গেলেন। এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে বশির আহমদ সাহেব ছুটে এলেন। তাঁর হাতে একটি কাগজ। অপরিচিত অনেক মানুষ দেখে তিনি প্রথমে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর পায়ে পায়ে মাসুদের সামনে এলেন।

ঃ এটি আপনার। কাগজটি এগিয়ে দিলেন তিনি। মাসুদ হাত বাড়িয়ে কাগজ নিলো। মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলো। কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে। মনে হচ্ছে খুবই ভয়াবহ কিছু লেখা আছে তাতে।

ঃ কখন এসেছে ফ্যাক্সটি?

ঃ এই মাত্র।

ঃ আপনি ফ্যাক্স পাঠিয়ে দিন। আমি এক্ষুণি রওনা হচ্ছি।

ঃ কিন্তু, আপনি যে অসুস্থ্।

ঃ সামান্য। আপনি খবর পাঠিয়ে দিন।

ঃ জি আচ্ছা। বশির সাহেব চলে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু মহিলার কথা শুনে আবার থেমে গেলেন।

ঃ কিন্তু তোমার তো এখন যাওয়া হবে না বাবা।

ঃ আমাকে যে যেতেই হবে মা।

ঃ তোমাকে দোয়া করার সাথে সাথে আরো একটি কাজ করতে এসেছি আমি।

ঃ উত্তরাঞ্চলের মুজাহিদ মোল্লা হাসান, শীর্ষ স্থানীয় নেতা গোলাম

রব্বানীসহ প্রায় এক ডজন মুজাহিদ নেতা ও দশজন বিশিষ্ট আলেমকে ওরা বন্দি করেছে। ওদেরকে যে উদ্ধার করতে হবে মা।

ঃ সে পথে তোমাকে আমরা বাধা দিবো না। কিন্তু মাত্র দুটি দিন এখানে থেকে যাও তুমি।

ঃ তা হলে সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না কিছুই।

ঃ কিন্তু তুমি যে অসুস্থ মাসুদ। আমাদের দিকে নাই বা তাকালে।

ঃ আমি আপনার দোয়া চাই মা।

ঃ খালাম্মা। ইনি যে মারাত্মক আহত। তার হাতে ব্যাণ্ডেজ। কান্নায় ভেঙে পড়ে ফাহিমা। মাহবুব ও সাদিকের চোখেও পানি।

ঃ পাগলি মেয়ে আমার। তুমি এভাবে কাঁদলে চলবে কি করে। যুগে যুগেই মহীয়ষী মুসলিম মা তার সন্তানকে, মুজাহিদ স্ত্রী তার প্রিয়তম জীবন সাথীকে যুদ্ধ সাজে সাজিয়ে দিয়েছেন। নারী যে পুরুষের উৎসাহ, জীবনান্দের প্রেরণা। তোমার উৎসাহইতো মাসুদের বীরত্বের হাতিয়ার ফাহিমা।

ঃ খালাম্মা- কিছু বলতে পারলো না সে। বাকরুদ্ধ হয়ে এলো কান্নায়।

ঃ মাহবুব! বোনকে দেখো। এ মুহূর্তে তোমার আর নতুন অপারেশনে যাওয়ার দরকার নেই। সাথে সাদিক রইলো।

ঃ কিন্তু মাসু-দ-ভাই-

ঃ ছিঃ মাহবুব! এ ভাবে ভেঙ্গে পড়া তোমার শোভা পায় না। মা! দোয়া করুন। মহিলা মাসুদের দিকে হাত প্রসারিত ক্ষীণ স্বরে দোয়া করতে লাগলেন। তার দু'চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। যাও বাবা, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন।

ঃ আসি ফাহিমা, দোয়া করো। কিছু বলতে পারলো না ফাহিমা। বাকরুদ্ধ হয়ে এলো কান্নায়। খালাম্মাকে মাসুদা শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো সে।

ঃ বশির সাহেব চলুন আল্লাহর নামে রওয়ানা করা যাক।

জীপে বসে স্টার্ট দিলেন কর্ণেল (অবঃ) বশির। মাসুদ সফরের দোয়া ও আয়াতুল কুরসী পড়ছে বিড় বিড় করে। গাড়ি ছুটতে শুরু করেছে পাহাড়ী উপত্যকার আঁকাবাকা পথ বেয়ে।

কথাশিল্পী আহমাদ হাসান দানী রচিত
'বিশ্ব কাঁপানো বিমান ছিনতাই ঘটনা'

॥ এক ॥

তাসখন্দের হিলটন হোটেল। সাত তলার ৭৩ নং কক্ষে গোল হয়ে বসে পরামর্শ করছে ৫ জন যুবক। একজনের হাতে একটি কাগজের ম্যাপ। এতে কাঠমাণ্ডু থেকে লন্ডনগামী ফ্লাইটের রুটগুলো লালকালিতে আঁকা। বোম্বে থেকে লন্ডন যাওয়ার রুটগুলো খয়েরি কালিতে। এ যুবকের নাম নাসির। সে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। বাড়ি বাংলাদেশের যশোর। পাশের যুবকদুটো ভারতীয়। একজনের নাম শাকিল, অন্যজন ওয়াসীম। এরা দু'জনই এমন পরিবারের সদস্য, যে পরিবারগুলোকে দাঙ্গার সময় মেরে কেটে আগুনে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে। দাঙ্গার রাতে এরা বাড়িতে না থাকায় প্রাণে রক্ষা পায়। পরে স্কুলবোর্ডিং থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে শুনতে পায় যে, দাঙ্গাবাজরা তাদের বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে সারাবাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে বাড়ির ছোট বড় নারী পুরুষ সবাই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শাকিল ও ওয়াসীম এরপর আর স্কুলে ফিরে যায়নি। ওরা এসে আশ্রয় নেয় পাশের শহরের এক ত্রাণশিবিরে। যেখানে দাঙ্গায় গৃহহারা, আত্মীয়-স্বজনহারা লোকজন আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানেই তাদের পরিচয় হয় এক ঘড়ির মেকারের সাথে। যিনি কাছের এক মার্কেটের সিঁড়ির নিচে বসে ঘড়ি মেরামত ও ছোট্ট ব্যাটারী বিক্রি করতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে ঘড়ির মেকার ফরহাদ ভাই ওদের বললেন, তোমরা এখন কী ভাবছ?

ঃ কিছু জানি না আমরা। বলল ওরা।

ঃ যদি কোনো কাজ চাও, আমাকে বলো। এ পর্যন্ত বলেই নিজের দোকানের ঠিকানা দিয়ে ফরহাদ ভাই চলে গেলেন।

এরপর যেদিন ত্রাণশিবির বন্ধ করে দেয়া হল। পুলিশ এসে সবাইকে নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে চলে যেতে বলল; তখন শাকিল আর ওয়াসীমের কিছুই করার ছিল না। ওরা গিয়ে ফরহাদ ভাইয়ের সাথে দেখা করে নিজেদের অসহায়ত্বের কথা বললে তিনি তাদের একটি মেসে নিয়ে তোলেন এবং একসময় শাকিল ও ওয়াসীমকে নিয়ে যাওয়া হয় মজলুম মুসলমান নারী

পুরুষ ও শিশুদের নিয়ে গড়া পুনর্বাসন পল্লীতে। ওখানেই তাদের পিতা-মাতার স্নেহ দিয়ে লালন করেন পুনর্বাসন পল্লীর পরিচালকবৃন্দ। পল্লীর শিক্ষালয়ে তারা কয়েক বছর লেখাপড়া করে একসময় নিজেদের ইচ্ছায় যোগদান করে বিশ্ব মুজাহিদ সংস্থায়। ছ'মাস ট্রেনিংয়ের পর তাদের পাঠানো হয় উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পার্বত্য দুর্গম ঘাঁটিতে। ওই প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর শাকিল ও ওয়াসীমকে আন্তর্জাতিক জিহাদ কমিটির অপারেশান উইংয়ের সদস্য নির্বাচন করা হয়। গত মাসেই তারা তাসখন্দের মাটিতে পা দিয়েছে। হিলটন হোটেলের সাত তলায় তাদের জরুরি ব্রিফিং দিচ্ছেন এশিয়া অঞ্চলের মুজাহিদ কো-অর্ডিনেটর হাফেজ জিয়াউল হাসান।

হোটেল কক্ষের বাকি দু'জন যুবকের বাড়ি আফগানিস্তানে। ওরা দু'জনই তালিবান বিপ্লবের সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত ছিল। বর্তমানে এরা পাঁচজন বিখ্যাত আরব মুজাহিদ নেতাকে মার্কিন ও ইসরাইলী নির্যাতন সেল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটা পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাসখন্দে রয়েছে। এদের একজনের নাম গুল মুহাম্মদ, অপরজন বাবর খান। এরা দু'জনই কাবুল ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ। বাবর খান শুরুতে মাদরাসা থেকে দাওরা পাস করে ছিল। আর গুল মুহাম্মদ কম্পিউটারের পাশাপাশি আইনের উপরও পড়াশোনা করেছে।

আলোচনা ও পরস্পরের মতবিনিময়ের মধ্যেই হঠাৎ কক্ষের দরজায় টোকা পড়লো। গোপন কোড বুঝে দরজা খুললো বাবর খান। কক্ষে প্রবেশ করলেন হাফেজ জিয়াউল হাসান। তার দু'পাশে দু'জন ক্যাডার। কারী হামিদুল্লাহ ও ডাঃ আজিজুল হক। এদের চেহারা ও পোশাক-আসাক দেখে বোঝার উপায় নেই যে এরা কত দুর্ধর্ষ অস্ত্রবাজ। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে এদের গোপন পকেট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে মারাত্মক অস্ত্র। বিশেষ কায়দায় প্রস্তত জুতার গোড়ালী থেকে বেরোয় চকচকে ছুরি। ট্রেনিং তাদের এতই পাকা যে, সম্পূর্ণ খালি হাতে তারা যে কোনো দেশের ৮ থেকে ১০ জন সৈন্যকে ঘায়েল করতে সক্ষম। হাফেজ জিয়াউল হাসানের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এ দুই মর্দে মুজাহিদ আল্লাহর পথের সৈনিক। কক্ষে প্রবেশ করেই সাথীদের সালাম দিয়ে সকলের পরিচয় জ্ঞাত হলেন হাফেজ জিয়াউল হাসান। খুব ধীর অথচ অকম্পকণ্ঠে বললেন, আমাদের পাঁচ

আরব মুজাহিদ কমান্ডার ইসরাইলী কারাগারে বন্দী। তাদের মুক্ত করে আনা এখন বিশ্ব ইসলামী জিহাদ মুভমেন্টের জন্য নিহায়ত জরুরি। হযরত আমীরুল মুজাহিদীন শায়খে আকবর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে করেই হোক তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে। এ নিয়ে আমি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে কর্মরত মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছি। তারা সকলেই একই ধরণের পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন, এ বিষয়ে আফগানিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশী যুবকরাই অধিক যোগ্য। অতএব, আমি খুব ভেবেচিন্তে গুল মুহাম্মদ ও বাবর খানকে খবর দিয়েছি। তারাই পছন্দ করেছেন শাকিল ও ওয়াসীমকে। আর শায়খে আকবরের ব্যক্তিগত সিলেকশানে এসেছেন বাংলাদেশের নাসির ভাই।

ডাঃ আজিজুল হকের হাতে থাকা পার্সোনাল কম্পিউটারটি টেবিলে রেখে পাওয়ার অন করলেন তিনি। বাটনে আঙ্গুল টিপে একটি গ্রাফিক্স ডিজাইন তৈরি করলেন হাফেজ জিয়াউল হাসান। এবার সব সাথীকে ডেকে বললেন, এই হলো কাজের ছক। কাঠমুণ্ড বা বোম্বে থেকে একটি জাম্বো জেট ছিনতাই করে তা চীনে নিয়ে যেতে হবে আপনাদের। সেখানে বসে যদি আপনারা দরকষাকষি করে পাঁচ মুজাহিদ ভাইকে মুক্ত করতে পারেন তো ভাল কথা। নতুবা বিমানটি শূন্যে উড়ন্ত রেখেই কথা চালিয়ে যেতে হবে মার্কিনী ও ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের সাথে। যদি সমাধান না হয় তাহলে নিজেরা ধরা না পড়ে যে কোনোভাবে সটকে পড়তে হবে, অগত্যা যাত্রীদেরসহ বিমানটি উড়িয়েও দিতে হতে পারে আপনাদের। তাছাড়া যে ফ্লাইটটি আমরা ছিনতাই করব তাতে সম্ভবত সব যাত্রীই থাকবে আমাদের শত্রুপক্ষের। চেষ্টা করা হবে যেন বিশেষ কিছু যাত্রী অথবা ইঙ্গ-মার্কিন ভিআইপিও থাকে সে ফ্লাইটটিতে।

সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করলেন সাথীরা। এ সবেরই টেকনিক্যাল উত্তর দিলেন হাফেজ জিয়াউল হাসান। বিমান সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বললেন ইঞ্জিনিয়ার নাসির। গুল মুহাম্মদ ও বাবর খান বললেন তাদের জঙ্গী বিমান উড্ডয়ন ও চালনার অভিজ্ঞতার কথা। আর শাকিল ও ওয়াসীম তাদের নির্ভীক উচ্চারণে জানাল খোদার রাহে জীবন দানের অদম্য স্পৃহার পাশাপাশি যে কোনো সময় আমিরের নির্দেশে শত্রুকে হত্যার প্রস্তুতির কথা

কারী হামীদুল্লাহ কম্পিউটারে একটি বিমান ছিনতাই প্রোগ্রাম ইনস্টল করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এর সবদিক দেখাচ্ছেন। আগামী দশটি দিন তাসখন্দের ফ্লাইং ক্লাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে যাবে এই গ্রুপের তিনজন সাথী। সন্ধ্যার পর পার্বত্য এলাকায় গিয়ে শুটিংয়ে অংশ নেবে সকল সাথী।

॥ দুই ॥

আজ রাত সাড়ে আটটায় হোটেল কক্ষে তাদের ফাইনাল প্রোগ্রাম দেয়া হবে। মাগরিবের পর থেকেই খুব টেনশান ফিল করছে ৫ যুবক। নাসির টানটান উত্তেজনা নিয়েই বলল, যদি অপারেশানে গিয়ে শহীদ হই তাহলে তো দুঃখ নেই কিন্তু ৫ আরব বীর মুজাহিদকে উদ্ধার করা কি সম্ভব? শাকিল ও ওয়াসীম একই সাথে বলে উঠল, শহীদ হওয়ার দরকার যদি হয় তাহলে এ জন্যে আমরা দু'জন তো রয়েছিই। নাসির ভাইয়ের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কারণ আমীরুল মুজাহিদীন তাকে খুবই পছন্দ করেন এবং বিশ্বব্যাপী নানা গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন অপারেশানের সময় তার ডাক পড়ে। এরমধ্যে বাবর খাম বলে উঠল, ভাই, নার্ভাসনেস থেকে এ ধরনের কথা অনেকেই বলে। আমার মনে হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের ভাইয়েরা বিষয়টি নিয়ে নানা ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এটি কাজের জন্য বেশ ক্ষতিকর। আপনারা ধরে নিন, আমরা প্রত্যেকেই শহীদ হওয়ার জন্যেই এ কাজে অংশ নিচ্ছি। কিন্তু শহীদ হওয়াটাই এখানে মুখ্য নয়। এখানে মিশন সফল হওয়াও উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের কাজে সফল হব এবং বীর মুজাহিদ নেতৃবর্গকে মুক্ত করে ছাড়ব। এরপর যদি ভাগ্যে শহীদী মৃত্যু থাকে তাহলে সেটাও হতে পারে। এ ব্যপারে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। কেননা, মূলত মৃত্যুর পর আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে হাসিমুখে হাজিরা দিতেই এ যুদ্ধ-জিহাদের পথে নেমেছি। লক্ষ্য জয় আমাদের উদ্দেশ্য আর শাহাদত আমাদের কাম্য।

সাথীদের এ ধরনের কথাবার্তা চলার ভেতরই গুল মুহাম্মদ কফির পেয়ালা সাজিয়ে এনে টেবিলে রাখল। সাথে আখরোটের প্লেট। সবাই ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। এরিমধ্যে বেজে উঠলো নাসিরের সেলফোন। বাইরে আজান হচ্ছে তবে এসি রুমে এ আওয়াজ আসছে না। হোটেলের লবি থেকে ফোন করছেন কারী হামীদুল্লাহ। বললেন, আজ শেষরাতে

এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা বলে আপনারা হোটেল ত্যাগ করবেন। হোটেলের সামনেই গাড়ি থাকবে।

রাত সাড়ে তিনটায় হোটেলের সামনে থেকে একটি ল্যান্ড রোভার রওনা হয়ে গেল ৫ জন সাথী নিয়ে। ড্রাইভ করছে হাফেজ জিয়াউল হাসান। পাশের আসনে নাসির। পেছনে বাকি সবাই গুটিশুটি মেরে বসে আছে। ঘন্টা দেড়েক চলার পর তাদের গাড়িটি একটি আন্তজেলা ট্রাকস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে সবাইকে নামতে বললেন হাফেজ জিয়াউল হাসান। একটি পণ্যবাহী ট্রাকে চড়তে বললেন সাথীদের। এ ট্রাকটিই তাদের নিয়ে সীমান্ত বরাবর চলে যাবে কাল ৭টা নাগাদ। এরপর নতুন রাহবার ও নতুন যানবাহন পাবে তারা। ট্রাক ড্রাইভার আলাউদ্দীনও জিহাদ গ্রুপেরই কোরবানী ওয়ালা সাথী। কিছুদিন মাদরাসায় পড়ার পর সে আফগান জিহাদে যোগ দিয়েছিল। এরপর থেকে মুজাহিদদের খেদমতেই লেগে আছে সে। আফগানিস্তানের প্রধান আরব উপদেষ্টা, ত্রাণ ও সেবা দফতরের চীফ শায়খ তামিম আদনানীর ড্রাইভার ছিল আলাউদ্দীন। আমেরিকার এক হাসপাতালে শায়খ আদনানীর রহস্যজনক মৃত্যুর পর থেকে সে মধ্য এশিয়া ও আফগান সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে ট্রাক ড্রাইভার হিসেবে কর্মরত আছে বটে কিন্তু জিহাদ গ্রুপের অস্ত্র, সৈন্য ইত্যাদি আনানেয়ার ব্যবস্থা করাই তার মুখ্য দায়িত্ব। আল্লাহর রহমতে মধ্য এশিয়ার কতিপয় গবেষণাগার থেকে এটম বোম বানানোর সর াম ও কাঁচামাল মুজাহিদদের গোপন ঘাঁটি ও মোবাইল ল্যাবরেটরীতে পৌঁছে দেয়ার কাজও তার সহযোগীরাই করেছে। তালিবান সরকারের পতনের পর যে কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকলেও পুনরায় এখন তা চালু হয়েছে।

আলাউদ্দীন বিসমিল্লাহ বলে ট্রাক চালু করলে হাফেজ জিয়াউল হাসানও ল্যান্ড রোভার স্টার্ট করলেন। খোদা হাফেজ বলে হাত নাড়লো সকল সাথী। আলাউদ্দীন বলল, বড় মোবারক সময় ভাইসব, খাস দিলে আল্লাহর দিকে তাওয়াজ্জু করেন এবং জিকিরের সাথে সফর জারি রাখেন। গোঁ গোঁ শব্দ করে ছুটছে সাতটনী হিনো ট্রাক। উপরে তুলার বস্তা। এর উপর শুয়ে আছে ন৫ জন মুজাহিদ।

ট্রাক তাদের নামিয়ে দিল একটি শষ্যক্ষেতের পাশে। দশ কদম দূরের একটি মাঠে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাইভেট হেলিকপ্টার। হলুদ বর্ণের কপ্টারটির গায়ে লেখা 'মাইনর এশিয়া সীড কোং।' এতে চড়ে এ ৫ জন মুজাহিদ রওনা করলেন আফগান সীমান্তের দিকে। বেশ কয়েক ঘন্টা ওড়ার পর কপ্টারটি তাদের নিয়ে যে জায়গাটিতে ল্যান্ড করল সেখান থেকে পাকিস্তান খুব বেশী দূরে নয়। তালিবানদের একটি সিকিউরিটি টিম তাদের সাথে আইএসডি সেল ফোনে সবসময় যোগাযোগ রাখলেও তারা অপারেশন সম্পর্কে কোনো কথাই সরাসরি বলছেন না। কোড ল্যাংগুয়েজে যে সব কথা হচ্ছে তা কোনো গুপ্তচর বা বিদেশী এজেন্ট তো দূরের কথা এজেন্টের বাবাও বুঝবে না। একটি রেস্ট হাউজে গোসল খাওয়া বিশ্রাম সেরে তারা পুণরায় রওনা হলেন জীপে চড়ে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী চমন শহর হয়ে পাক-ভারত-চীন সীমান্তের পথে। এবার ১৩ ঘন্টার সফর। পথে ৩টি ঘাঁটিতে তারা নামায ও বিশ্রাম সেরে নেবেন। রাত দেড়টায় তাদের সাথে সাক্ষাত হবে অপারেশন চীফ তারেক মাহমুদের সাথে। দেওবন্দ মাদরাসার ফারেগ এ জবরদস্ত আলেম একজন দুর্দান্ত পাইলট ও কম্পিউটার বিজ্ঞানীও বটেন। যেমন তাঁর চেহারা, তেমনই তার ভাষণ দোয়া আর মোনাজাত। শায়খে আকবরের নির্দেশ অনুযায়ী তারেক মাহমুদ সাহেব এ অপারেশনে আমিরের দায়িত্ব পালন করবেন। ঘটনা শুরুর প্রাক্কালে মাওলানা তারেক মাহমুদের হাতে পাঁচ মুজাহিদের বায়আত করার হুকুমও শায়খ দিয়েছেন।

॥ তিন ॥

পার্লামেন্ট হাউজের ঘড়িগুলো ঠিকঠাক রাখার জন্য যে ইলেক্ট্রিশিয়ানরা কাজ করে তাদের মধ্যে এবং লিফট, বিদ্যুৎ, এয়ার কন্ডিশান বিভাগের কিছু কর্মী ফরহাদ ভাইয়ের মাধ্যমে জিহাদী কার্যক্রমের সহযোগিতায় জড়িত। এদের প্রায় সবাই অমুসলিম তবে নেতা ও অফিসারদের শোষণ, অনাচার ও দুর্ব্যবহারে এরা এতই অতিষ্ঠ যে সুযোগ পেলেই এরা নেতাদের শায়েস্তা করতে প্রস্তুত। তাছাড়া, ফরহাদ ভাই এসব গরিবশ্রেণীর লোকদের বিপদাপদে বায়তুল মাল থেকে যথাসম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। গত মাসে পার্লামেন্টের সুইপার শ্রীদেবীর হার্ট এটাক করার খবর পেয়ে

ফরহাদ ভাই তার চিকিৎসা ও ২ মাস বেড রেস্টের সকল ব্যবস্থা করেন। ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হয় শ্রীদেবীর পেছনে। দেবী তার দুই পুত্রসহ এখন প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় কিন্তু ফরহাদ ভাই তাদের গোপনে কলেমা পড়ালেও প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দিতে নিষেধ করেছেন, অন্যথায় পার্লামেন্টে তাদের জিহাদী মিশন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। গত রাতে ফরহাদ ভাই তার সোর্সের মারফত খবর পেলেন ইসরাইলী একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল, আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের ২ জন আন্ডার সেক্রেটারী, সিআইএ'র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রধান ২১ তারিখের সকাল সাড়ে দশটার ফ্লাইটে লন্ডনের হিথরো হয়ে নিউইয়র্ক যাবেন। প্যান আমের একটি বিশেষ বিমান তাদের বহন করবে। পার্লামেন্টের সার্ভিস সেক্রেটারী তাদের টিকেট, ইমিগ্রেশন ফি ইত্যাদির ব্যবস্থা করছেন। দীর্ঘ দেড় বছর এ ধরনের ভিআইপি প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাওয়া একটি ফ্লাইটের অপেক্ষায়ই ছিলেন ফরহাদ ভাই। আইএসডি সেলফোনে মুজাহিদ হেড কোয়ার্টার্সে যোগাযোগ করলেন তিনি। মুজাহিদদের জন্য লন্ডনের টিকেট কাটতে বলা হল তাকে। মাওলানা তারেক মাহমুদের টিকেট কাটা আছে কেবল কনফার্ম করিয়ে নিলেই হবে।

শ্যামল আর অসীম নামে নতুন পাসপোর্ট ভিসা তৈরি হয়ে গেল শাকিল ও ওয়াসীমের। এরা এখন শ্রীদেবীর দুই পুত্র। মায়ের উন্নত চিকিৎসার জন্য মাকে নিয়ে তারা যাচ্ছে জার্মানী। এথেন্সে নামবে ওরা। ওখানকার এক চ্যারিটেবল ফাউণ্ডেশান তাদের চিকিৎসার ব্যয় বহন করছে। সংস্থার প্রতিনিধি মিশেল আর বিশেষজ্ঞ এক চিকিৎসকও সফর সঙ্গীরূপে রয়েছেন। এদের একজন নাসির অন্যজন বাবর খান। গুল মুহাম্মদ এদের কেউ না। তিনি নিউইয়র্কে মাল্টিপল ভিসাধারী ট্যাক্সি ড্রাইভার। মাওলানা তারেক মাহমুদ আলেমের বেশেই যাবেন। তিনি লন্ডনের একটি ধর্মীয় সমাবেশে লেকচার দেয়ার দাওয়াত পেয়ে চলেছেন লন্ডনের পথে। এরা কেউ কাউকে চিনে না। ঘড়ির মেকার ফরহাদ ভাই যাবেন সুইপার শ্রীদেবীর গার্জিয়ান স্বরূপ তাকে বিমানে তুলে দিতে। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় স্ট্রেচারে বহন করে নিয়ে যাওয়া রুগীর জন্য তো একজন দু'একজন এমনিতেও দরকার।

॥ চার ॥

দু'টি দেশের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে অবশেষে মুজাহিদ গ্রুপটি এসে পৌঁছুল তাদের কাঙ্ক্ষিত শহরে। এখান থেকেই তারা বিমানে চড়ে রওনা হবে আকাশের বুকে একটি শ্বাসরুদ্ধকর যুদ্ধের পথে। গোটা পৃথিবীকে বিচলিত করবে তাদের বিমান ছিনতাই নাটক। এয়ারপোর্টের কাছে ছোট্ট একটি রেস্ট হাউজে উঠল মুজাহিদ টিম। পুলিশ কমিশনার পি. এল. ত্রিপাঠির ড্রাইভার হরিচরণ ফরহাদ ভাইয়ের রিক্রুট। হরিচরণ ২ বছর যাবত মুসলমান। নাম, পরিচয় প্রকাশের হুকুম পায়নি এখনও হযরত শায়খের তরফ থেকে। হযরত বলেছেন, যে যেখানে আছ, গোপনে খেদমত করে যাও। কেননা, ইসলাম কবুলের খবর প্রচার হওয়ামাত্রই তোমরা চাকুরি থেকে বরখাস্ত কিংবা বদলি হবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আর ঢুকতে পারবে না। কোনো মুসলমানের এ সমাজে উচ্চপদ লাভ সম্ভব নয়। অতএব, যত মানুষ ইসলাম কবুল করবে তাদের অধিকাংশকেই এখন পরিচয় গোপন রাখতে হবে। কেননা, যদিও ইসলাম গ্রহণের জন্য অন্তরে বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ ও কার্যে প্রতিফলন জরুরি। তবে প্রকাশ্যে ঘোষণা কিংবা সমাজকে প্রদর্শন না করাও ক্ষেত্র বিশেষে না করাও উত্তম বিবেচিত হতে পারে। হরিচরণের সপরিবারে ইসলাম গ্রহণের কাহিনী আরেক দীর্ঘ উপন্যাসের মত। তার সুন্দরী বউকে অন্যায়ভাবে হাত করতে চেয়েছিল সমাজের বড় কিছু রুই-কাতলা। এর সপক্ষে ছিলেন তারই বড়কর্তা।

সমাজ ও কর্মস্থল উভয় ক্ষেত্রে হতাশ হয়ে সে যখন কোণঠাসা তখনই একদিন সে আক্রান্ত হয় চরমপন্থী এক গ্রুপের মস্তানদের দ্বারা। ওরা দাঙ্গাবাজির ফাঁকে ফাঁকে নীচু জাতের দরিদ্র লোকদের সুন্দরী বউ ঝি'র প্রতি কুনজর দেয়। ধরে নিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গোপন আস্তানায় রাখে। অভিজাত ব্যক্তিদের যৌনদাসী বানানোর পাশাপাশি এদের দিয়ে পর্ণ ফিল্ম ও সিডিও তৈরি করে। বিশ্বব্যাপী এখন পর্ণ সামগ্রীর বাণিজ্যে এসব সমাজপতি ও আমলারাও সমান অংশীদার।

হরিচরণের বউ ললিতাকে এক অভিশপ্ত দিনে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় ওরা। এরপর দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়েও আর তাকে উদ্ধার করতে পারেননি হরিচরণ। শেষ পর্যন্ত সে আশ্রয় নেয় মুজাহিদ গ্রুপের। মুজাহিদরা তাকে

ওয়াদা দিয়েছেন যত দিনই লাগুক তারা ছাপা মেরে বের করে আনবেন ললিতাকে ওইসব গোপন আস্তানা থেকে। শুধু ললিতা নয়, ললিতার মত বিপন্ন অসহায় লাঞ্ছিত হাজার নারীকে একদিন মুক্তির আকাশ উপহার দেবে মুজাহিদ গ্রুপ। মুসলমান নামধারী যে সব কুলাঙ্গার এসব অপকর্মের সাথে যুক্ত তাদেরও কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। বিধর্মীদের চেয়ে মুসলমান নামধারীদের সাজার পরিমাণ হবে দ্বিগুন। যারা সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায় তাদের জন্য কোরআন শরীফেই দ্বিগুন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

এরপর থেকে হরিচরণ এবং তার মত শত-সহস্র মজলুম মানুষ ফরহাদ ভাইয়ের সার্কেলে জড়িত হয়ে অপেক্ষা করছে মুক্তি ও স্বাধীনতার। তারা ফিরে পেতে চায় নিজেদের মর্যাদা, প্রেম ও অধিকার। এ শহরে সাড়ে চার হাজার লোক এখন হরিচরণের মত অপেক্ষার দিন গুনছে। ওরা অনেকেই ইসলাম কবুল করে নিয়মিত প্রার্থনায়ও শরিক হচ্ছে। নদীর তীরে বড় মন্দিরটির সাথে একটি ধর্মশালায় গভীর রাতে নামাজ ও জিকির হয়। দূরবর্তী পার্বত্য এলাকার কিছু উপজাতি ও খৃস্টান নাগরিকও মুসলমান হয়ে এ ধর্মশালায় অবস্থান করছে। যারা নানারকম সামাজিক অনাচার ও বৈষম্যের প্রতি রুষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিস্ফোরক ও অস্ত্রের চালানটি হরিচরণ তার বস পুলিশ কমিশনার মি. ত্রিপাঠির জীপে করে নিয়ে এসেছে গত ছুটির দিনে। এসব এখন এক নওমুসলিম ঈসায়ীর মালিকানাধীন ডেভিড স্টুডিওতে। মেকাপ রুমে আয়নায় নিজেকেই চিনতে পারছিল না কার্ডিয়াক স্পেশালিস্ট ড. ব্লেয়ার আর এথেন্সের এরিসটো চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি মি. মিশেল। শত টেনশানের মধ্যেও হাসি পাচ্ছে নাসির ও বাবর খানের। ভাবল, হায়রে জিহাদ! তোমার জন্য কত কৌশলই না অবলম্বন করতে হয়। বিশ্বব্যাপী আল্লাহর মজলুম বান্দাদের জন্য গাজিদের কত কিছুই না করতে হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবতঃ এসব বিষয় বুঝাবার জন্যই বলেছিলেন যে, 'আল হারবু খিদআহ'। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষকে নানা পন্থায় বিভ্রান্ত করাই যুদ্ধের অন্যতম কৌশল। কেননা,

তাদের পরাজিত করতে না পারলে নিজের ধ্বংস ও পরাজয় অবধারিত। এখানে ভুল করার সুযোগ নেই। অসতর্কতার সুযোগ নেই। একটু ত্রুটির জন্যও সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বেশি মজা লাগছে শাকিল আর ওয়াসীমের নতুন চেহারা আর পোশাক দেখে। শ্রীদেবীর পুত্র তারা। নিষ্ঠাবান হিন্দু তরুণ। নিম্নবিত্ত জীবনে ইউরোপ ভ্রমণের উপযোগী সাজসজ্জা। মাওলানা তারেক মাহমুদ তাদের খুব ভাল করে ব্রিফ করছেন। তাদের চরিত্র অভিনয় করে দেখাচ্ছেন। ভাষা ও অভিব্যক্তিও বাদ যাচ্ছে না। এসব প্রস্তুতি কেবল ১৫/২০ মিনিটের প্রয়োজন। বিমানে চড়ার কিছুক্ষণ পরই তো তাদের আর অভিনয়ের প্রয়োজন পড়বে না। থাকবে না পোশাক ও মেকাপের বাধ্যবাধকতা। তখন কেবলই সতর্কতা, মেধা, আত্মবিশ্বাস, প্রশিক্ষণ আর স্থিরচিত্ততার কঠিনতম ব্যবহার। জীবন-মৃত্যুর খেলা। শক্ত এক লড়াই। হয় বিজয় ও মুক্তি, নয়তো বেঘোরে মরণ। শহীদী গন্তব্যে গর্বিত অভিযাত্রা।

শ্রীদেবীর বিদেশযাত্রার ব্যাপারে পার্লামেন্ট কর্মচারী সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তা সেক্রেটারীকে বললেন, আমাদের একটা দাবী স্যার শুনতেই হবে। সিডিউল ফ্লাইটে এমন মুমূর্ষু রুগীকে নেওয়ার অনুমতি পাওয়া খুবই মুশকিল। আগামী পরশু প্যান আমের যে স্পেশাল ফ্লাইট কয়েকজন ভিআইপি নিয়ে যাচ্ছে, এতে যে করেই হোক শ্রীদেবীকে তুলে দিতে হবে। এবং শ্রীদেবীর পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে বিমানভাড়া মওকুফ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নিকট সুপারিশ করতে হবে। সেক্রেটারী তাদের দাবী মত রাতেই স্পীকারকে ধরে এসব ব্যবস্থাই করে দিলেন। স্পীকারের প্যাডে লিখা এ মর্মের একটি চিঠিও তারা আদায় করল যাতে লেখা রয়েছে কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই পার্লামেন্টের নিজস্ব ক্লিনিকের এম্বুলেন্স শ্রীদেবীকে নিয়ে সরাসরি টারমাকে চলে যাবে এবং সরাসরি বিমানের দরজায় তাকে কেবিন ক্রুরা গ্রহণ করবেন। তার কাগজপত্র তার দুই পুত্র ও অন্যান্য সফর সঙ্গীরা এয়ারপোর্টে প্রদর্শন করবে।

॥ ছয় ॥

ভ্রমনের পূর্বরাত। বিদেশী প্রতিনিধিদলের সম্মানে এক বিদায়ী ডিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গ্রান্ড হিমালয়া হোটেলে চলছে। উর্ধ্বতন সরকারী, বেসরকারী ও সামরিক ব্যক্তিবর্গ এবং তাদর পরিাবারবর্গ এতে অংশ নিয়েছেন। অনাহূত ব্যক্তি কেবল একজন। তিনি ফরহাদ ভাই। পররাষ্ট্র দফতরের যে বহিঃপ্রচার ইউনিট দেশীয় বইপত্র স্মরণিকা, ছবি ও লিফলেট নিয়ে হোটেল লাউঞ্জের প্রবেশ করিডোরে স্টল লাগিয়ে বসে আছে, এখানেই একজন কর্মচারীরূপে তিনি ঢুকে পড়েছেন। অপর একজনের প্রক্সি হিসেবে। এ ধরনের কোন সুযোগ নিয়েই তিনি তার অদম্য ভূমিকা পালন করে থাকেন নানাস্থানে নানা সময়। এ দুর্দম জিহাদী ব্যক্তিটি যে কতটা ঈর্ষনীয় তা আন্দাজ করাও খুব কঠিন। হযরত আমিরুল মুজাহিদীন শায়খে আকবর একবার ইন্টারন্যাশনাল ডেলিগেট কনভেনশনে ফরহাদ ভাই সম্পর্কে বলেছিলেন, পৃথিবীর বড় বড় দশটি রাজধানীতে কোঅর্নিনেশন কাজের দায়িত্ব দেয়ার মত এমন দশজন লোক যদি পাওয়া যেতো তাইলে আমাদের কাজ আরও ১০০ বছর এগিয়ে যেতো।

স্টল পরিদর্শনের সময় আমেরিকা ও ইসরাইলের প্রতিনিধিদের ছবি গোপন মুভি ক্যামেরায় ধারণ করলেন ফরহাদ ভাই। খুব ভাল করে ষ্টাডি করলেন যে, দেশীয় নারী-পুরুষের মধ্যে কারা এদের বেশী ঘনিষ্ঠ। এদের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান্স বের করার জন্য কাজে লাগিয়ে দিলেন হোটেলের নর্থপ্লাজায় একটি ট্রাভেল এজেন্সীর সাইনবোর্ডে কর্মরত জিহাদ গ্রুপের মিডিয়া রিসার্চ টিমকে। রাত তিনটার দিকে ফরহাদ ভাই যখন একটু শুতে যাবেন তখনই বেজে উঠল রিসার্চ ইনচার্জ হায়দার খানের কল। মোবাইল ধরে তিনি বললেন, ফজরের নামাজের সময় ইনফরমেশনের পুরো প্যাকেট আমাকে পাঠিয়ে দিও।

ফোন রেখে দিয়ে ফরহাদ ভাই আধ ঘন্টা চোখ বুজে পড়ে রইলেন। এখন ঘুমালে আর ফজর ধরতে পারবেন না। বছরের প্রায় সব রাতই তার এভাবেই কেটে যায়। অল্প একটু তাহাজ্জুদ পড়ে ২০/২৫ মিনিট আগামী দিনের অভিযানে সাথীদের নিরাপত্তা ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে একটু রোনাজারি করবেন তিনি। নামাজ শেষে কিবলামুখী হয়েই

বসে রইলেন ফরহাদ ভাই। এবার তার হৃদয়ে অনুভত হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় সুখের পরশ। রহমতের মহাসাগরে হাত পা ছেড়ে দিয়ে যেন নির্ভার ফরহাদ ভাই ভেসে আছেন। কোন দুঃখ, শোক, তাপ, দাহ, কষ্ট-বেদনা কিছুই নেই তার জীবনে। নেই কোন দুঃখের স্মৃতি। নেই উৎকণ্ঠা বা ভীতি। এমন নির্মল শান্তি কেবল শেষ রাতের তাহাজ্জুদেই তিনি পান। এরপর বাধভাঙ্গা জোয়ারের মত নেমে আসে অশ্রুর ধারা। দীন ও দুনিয়ার মালিককে সব কথা আজও স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই বলতে লাগলেন তিনি।

'হে মালিক, তুমি তো জান, গত কিছুদিন ধরে কী টেনশানেই না আছি আমি। কত ঝুকির ভেতর কাজ চালাতে হয় আমাকে। দিনরাত ২৪ ঘন্টা মৃত্যুর মুখেই বিচরণ করি এ দেশের বুকে। কত ধরনের কাজ, যোগাযোগ, কৌশল আর পন্থা যে আমার করতে হয় তা তোমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? আচ্ছা, আগামী কালের মিশন সকল হওয়া যদি তোমার দৃষ্টিতে মঙ্গলময় হয় তাহলে তাই করো। আর না হয় আমি জোর করে তোমার কাছে নির্দিষ্ট কিছু চাইব না। যদি মিশনের সাথীদের ব্যর্থতা, পরাজয় বা মৃত্যুর মধ্যে কল্যান থাকে তাহলে এসবের জন্যও আমি তৈরি। কিন্তু মানবতার মুক্তি আর ঈমানী বিশ্বব্যবস্থার সংগ্রাম যেন বন্ধ না হয়। কাকে দিয়ে করাবে জানি না, কতদিন সময় নিবে তাও জানি না, কিন্তু বড় সাধ জাগে এ শুভ সময়টি নিজের চোখে দেখতে। বড় ইচ্ছা জাগে নিজেকে এ কাজে নিঃশেষে নিবেদন করতে। হে আল্লাহ, তোমার হাবীবের ওসীলা দিয়ে বলছি, এবার অবিশ্বাসীদের উপর আমাদের বিজয় দান কর। আমাদের কদম মজবুত রাখ। পৃথিবীতে তোমার হাবীবের জীবন ব্যবস্থাকে জয়ী কর। মানবজাতির প্রতি বিশেষ করুণা কর। খাস রহমত নাযিল কর। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা তোমার হাবীবের সৈনিকদের তুমি নেগাহবানী কর। আমার ধৈর্য কম, আমি একটা অবুঝ পাগল, আমি গুনাহগার, আমি দুর্বল, আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না। পরীক্ষার ধকল সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। এ অঞ্চলের সকল মানুষকে দয়া করে ঈমানের নেয়ামত দান কর, এরপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন ফরহাদ ভাই। বুক থেকে তার বাষ্পের মত আওয়াজ উঠছে। কান্না আর কাতরানি ছাড়া ঘরে আর কোন শব্দ নেই। আমরা যদি

এখন শহরের অন্যসব মুজাহিদদের ঠিকানায় যেতাম,তাহলে সর্বত্রই এ একই দৃশ্য দেখতে পেতাম। শুধু এ শহরেই নয়, গোটা বিশ্বের সকল জনপদে আল্লাহর রাহের মুজাহিদরা শেষরাতে নফল নামাজ, দোয়া-কান্নাকাটি আর করুন রোনাজারির আমল চিরদিনই চালিয়ে যাবেন। কেননা, এটাই তাদের একমাত্র বিশেষ অস্ত্র যা দুনিয়ার অপর কোন শক্তির হাতে নেই।

ফজরের সময় খেজুরতলা মসজিদে কাগজপত্র ভরা একটা খাম জনৈক মাদ্রাসা ছাত্র ফরহাদ ভাইয়ের হাতে দিয়ে বাইরে চলে গেল। নামাজ শেষে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিবলামুখী হয়ে বসে আল্লাহর সানা সিফাত, তাসবীহ ও তাহলীল করা ফরহাদ ভাইয়ের সারাজীবনের অভ্যাস। জিকির ও মোনাজাত শেষে তিনি জামটি খুলে দেখালেন। পকেট থেকে কলম বের করে একটি নোট লেখলেন। ডঃ আহমাদ সাইফুল্লাহ দয়া করে নিচের ঠিকানাগুলোতে বেলা ১১ টায় একটি মেসেজ পাঠাবেন। মেসেজটি ১০-৫৫ মিনিটে আপনাকে দেরেব হরিচরণ। যাকে আমরা ঘরোয়াভাবে হারুন নামে ডেকে থাকি। খামটি তিনি ধরিয়ে দিলেন মসজিদের বাইরে অপেক্ষারত ছাত্রটির হাতে। এরপর চলে গেলেন তার মেসরুমটিতে। যেখানে দীর্ঘদিন ধরে আছেন এই ঘড়ির মেকার পরিচয়দানকারী সিদ্ধপুরুষ।

॥ সাত ॥

সিআইএ'র দায়িত্বশীল কর্মকর্তাটির রুম থেকে ঢুলুঢুল চোখে বিধ্বস্ত দেহে বেরিয়ে গেল একটি অপূর্ব সুন্দরী রমণী। তাকে নিয়ে একটি কালো টিনটেড গ্লাসের জীপ হোটেল এরিয়া ছেড়ে যাওয়ার পরই ছোট্ট ওয়ারলেস সেটটি চালু করল মালি হুমায়ুন। হ্যালো. আসসালামু আলাইকুম। নাম্বার সেভেন, হিমালয়া, ওই মেয়েটি চলে গেছে। বাকি রুমগুলো থেকে মেয়েরা এখনও বেরোয়নি। দু'জন তাদের রুমে মেয়ে লোক ঢুকায়নি। ওরা বেরুলে ওদেরও আমি ফলো করার ব্যবস্থা করেছি। এখন যে গেল তাকে আমরা চিনি না। তবে গাড়ির নাম্বার টুকে রেখেছি। মনে হয় সংস্কৃতিকর্মী কিংবা টিভি অভিনেত্রী ওভার।

ওপাশ থেকে জবাব এলো। নাম্বার সেভেন। তুমি সবগুলো মেয়েকে ফলো করার ব্যবস্থা কর। ভবিষ্যতে যতে ওদের কাজে লাগানো যায়।

সকলের হেদায়াতই মুখ্য। প্রয়োজনে দুশমনকে শায়েস্তা করতেও ওরা কাজে লাগতে পারে। আর ক্ষেত্র বিশেষে এদের থেকেও পাওয়া যাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এসব মেয়েরা তওবা করে আমাদের সাথেও যোগ দিতে পারে। খুব খেয়াল রাখ। আর প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় খবর জানাও। এয়ারপোর্টে রওনা হয়। গেছে বিদেশী সব অতিথি। প্রতিনিধি দল, সিআইত্র'র কর্মকর্তাসহ এ দলে মোট ১৭ জন সদস্য। এদের ৫ জন মহিলা। দু'একটি ট্রাভেল এজেন্সী মারফত এ স্পেশাল বিমানের একশ টিকেট পাবলিক পর্যায়ে বিক্রি করা হয়েছে। মোট ৩৪০ জন যাত্রী বহনের উপযোগী বিমান এ জাম্বোতে এখন ১১৭ জন প্যাসেঞ্জার। পাইলট, কো-পাইলট, কেবিন ক্রু ইত্যাদি সব মিলিয়ে ১৩০ জন। অতিথিরা কেবিনের এ-ওয়ান তথা প্রথম শ্রেণীতে বসবেন। বাকি যাত্রীরা ইকোনমি ও বিজনেস ক্লাসে।

পার্লামেন্ট সরকারী ক্লিনিকের এম্বুলেন্সে করে এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন ফরহাদ ভাই। ষ্ট্রেচারে শোয়া শ্রীদেবী। পেছনের ল্যাণ্ড ক্রুজারে বিশেষজ্ঞ ড. ব্লেয়ার, মিশেল ও শ্রীদেবীর দুইপুত্র শ্যামল আর অসীম। সম্পূর্ণ নিখুঁত যাত্রীদল। ট্যাক্সী ক্যাব ভাড়া করে বলেছেন মাওলানা তারেক মাহমুদ। টাউন সার্ভিসের বাসে চড়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলেন গুল মুহাম্মদ। গত রাতের শেষ প্রহরে তারা নফল নামাজ ও দোয়া শেষে মাওলানা তারেক মাহমুদের হাতে অভিযানের বায়আত করেছেন।

সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও মিনিস্টার-ইন-ওয়েটিং মার্কিন আণ্ডার সেক্রেটারীদ্বয়কে ভিআইপি লাউঞ্জে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। অন্য যাত্রীরাও চেকইন শেষে বিমানের সিড়িতে পা রেখেছেন। এরিমধ্যে এম্বুলেন্সটি স্পীকারের চিঠি দেখিয়ে ঢুকে গেছে এয়ারপোর্টের মূল ভবনের পেছনে দাঁড়ানো বিমানের দোরগোড়ায়। শ্যামল, অসীম, মিশেল ও ড. ব্লেয়ার ধরাধরি করে ষ্টেচারটি বিমানে তুলে নিলেন। সব প্যাসেঞ্জার যথারীতি নিজ নিজ আসন গ্রহণের পর বিমান যাত্রা শুরু করল। তখন ১০:৪৫ মিনিট।

॥ আট ॥

কাটায় কাটায় ঠিক সাত মিনিট পর শুরু করতে হবে কাজ। জর্জ মিশেলরূপী নাসির আহমাদ বিসমিল্লাহ বলে উঠে দাঁড়লেন। মাথার উপর লাগানো বোতাম চেপে তিনি কেবিন ক্রুকে আসতে বললেন। একজন এয়ারহোস্টেস এলো। মেয়েটি ইউরোপীয়। পকেটে লেখা নেমপ্লেট দেখে বোঝা যায় ওর নাম ইভা। মিশেল বললেন, আমাদের সাথের রুগীনীকে বিমানের শেষ ভাগে রাখা নিরাপদ নয়। আমরা ওকে ফাষ্টক্লাসে নিয়ে যেতে চাই। ইভা বলল, এ বিষয়টি ক্যাপ্টেনের কাছে বলতে হবে। মিশেল সাথে সাথে বললেন, ক্যাপ্টেন কি একবার এদিকে আসবেন অথবা তার সহকারী। ইভা বলল, আমি গিয়ে তাকে বলি। কথার টান থেকে মিশেল ধরে নিলেন যে ইভা জার্মান তরুণী। মিশেল তার জানা দুচারটি জার্মান সম্ভাষণ এবার কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। ইভা একটু প্রভাবিত হল। বলল, না হয় আপনিও চলুন ককপিটে। ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে বলবেন বিষয়টি। ইভার এত সহজ প্রস্তাবটি ইচ্ছে করেই কাজে লাগালেন না মিশেল তথা মুজাহিদ নাসির আহমাদ। বললেন, আপনি গিয়েই একটু তাকে রাজি করান নয়তো রুগীটির ক্ষতি হবে। আমি বরং তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। ইভা চলে যেতেই তিনি ডা ব্লেয়ার তথা বাবর খানকে নিয়ে ষ্ট্রেচারটি তুলে প্রথম শ্রেণীর দিকে ছুটে চলে গেলেন। ইভা সম্ভবতঃ ক্যাপ্টেনকে সবকথা বলে শেষও করতে পারেনি। এরিমধ্যে ককপিটে পৌঁছে গেছেন এরা দুই মুজাহিদ। যাদের আধুনিক পোষাক আর চেহারার মেকাপ তাদের অপূর্ব ইউরোপীয় রং-রূপ দিয়েছে।

খুবই শক্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে নাসির আহমাদ বিমান চালনার ডিকটেশন দিতে লাগলেন, নিখুঁত ও নিস্তরঙ্গ পরিভাষায়, তুখোড় পেশাদারী উচ্চারণে। মি. পাইলট, গো এহেড, ৬০ ডিগ্রী এঙ্গেল এট রাইট। ইউ ফ্লাই টু চায়না। মাষ্ট বি রিচ অন ওয়ান এন্ড হাফ এন আওয়ার। দ্যাটস অল ফর এ পেশেন্টস লাইফ রিস্ক। আইদার উই ডেষ্ট্রচ দ্যা ফ্লাইট বাই ভেরি পাওয়ারফুল এক্সপ্লোসিভ। সাপ দেখার মত ভয় পেয়ে গেলো ইভা। তার মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়েই যেত যদি না তার মাথার ২০ আঙ্গুল দূরে কালাশনিকভ হাতে বাবর খান দাঁড়িয়ে থাকত। একে-৪৭ হাতে নির্দেশ দিয়ে চলেছেন

নাসির আহমাদ। তিনি এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কথা না শুনলে আস্তে করে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে মেঝেতে শুইয়ে দেবেন তিনি দু' পাইলটকেই এবং খুব সহজভাবে বিমানটি তিনি নিজে চালিয়ে গিয়ে পৌঁছবেন চীনে। তাছাড়া, আরও দু'জন সাথী এখানে এমন আছেন যারা বিমান চালনায় সুদক্ষ।

নাসিরের নিষ্কম্প কণ্ঠের নির্দেশ শুনে দুই বৈমানিকই বুদ্ধিমানের মত তার হুকুম শুনতে লাগল। ওরা এবার জানতে চাইল যে, কন্ট্রোল টাওয়ারকে তারা নিজেদের আক্রান্ত হওয়ার কথা জানাবে কিনা। অথবা যাত্রীদের উদ্দেশে কিছু বলবে কিনা। এবার নাসির বললেন, যাত্রীদের আপনারা সংক্ষেপে বিষয়টি জানিয়ে দিতে পারেন। তবে কন্টোলকে আমরাই জানাবো। গন্তব্য, ট্রানজিট ও মিডিয়াকেও আমরাই সব বলব।

॥ নয় ॥

প্রথম শ্রেণীতে একজন রুগিনীর স্ট্রেচার দেখে একটু বিব্রতবোধ করছিলেন মার্কিন দুই আন্ডার সেক্রেটারী, সিআইএ'র কর্মকর্তা ও তাদের সহযাত্রীরা। ইভা ও নাসিরের আসা-যাওয়াও তাদের একটু উৎকর্ণ করেছিল। এবার ককপিটে ঘটে যাওয়া বিপ্লব টের না পেলেও এ উচ্চক্ষমতাশীল প্রতিনিধি দলের সিকিউরিটির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ঠিকই কোনো সমস্যার গন্ধ পেতে শুরু করলো। এদের একজন স্পাই বোতাম টিপে একজন ক্রুকে ডাকল। পেছন থেকে নিনা নামের এয়ার হোস্টেসটি ছুটে এলে লোকটি জানতে চাইল যে, এখানে রুগীর স্ট্রেচার কেন? নিনা বলল, বিষয়টি আমার জানা নেই তবে আমি এক্ষুণি ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে বিষয়টি আপনাকে বলব। নিনা যখন ককপিটের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, তখনই লাউড স্পীকারে ভেসে এল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। "সম্মানিত যাত্রী ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ! সম্ভবত আমরা একটু সমস্যায় আছি। অন্ততঃ দু'জন ছিনতাইকারীর চাপে বাধ্য হয়ে আমরা এখন ইউরোপের পরিবর্তে চীনের দিকে উড়ে চলেছি। বিমানের সকল যাত্রীর নিরাপত্তার জন্যেই আমরা বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কথা মত কাজ করাটাই সমীচীন মনে করছি। আশা করি আপনারা

কেউই কোন অবিবেচনাপ্রসূত কাজ বা আচরণ করবেন না। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন।"

ঘোষণাটি আবার হিন্দী ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় তর্জমা করা হল। সবাই বুঝে গেছে যে, ব্যাপার একটা ঘটতে চলেছে। নিনা মন্ত্রমুগ্ধের মত তার খুব কাছের আসনটিতে বসে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। ইভাও ককপিট থেকে বের হয়ে এসে নিনার পাশে বসল। সে রীতিমত কাঁপছে। মার্কিন গোয়েন্দা কমান্ডো জর্জ ব্লিট্স খুব শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন স্ট্রেচারটির কাছে। এরপর তিনি যা দেখলেন তা খুবই অদ্ভুত এক দৃশ্য। স্ট্রেচারটিতে আদৌ কোনো রুগী নেই। একটি নারীর মুখোশ পড়ে আছে এতে। আর সাদা চাদরের নীচে কোনো মানুষ নেই বরং মানুষের দেহাকৃতির ন্যায় একটি কাঠামো সাজানো হয়েছে ভারি কিছু অস্ত্র, গোলাবারুদ আর বিস্ফোরক দিয়ে। কিন্তু তিনি এসব বস্তুর উপর দখল প্রতিষ্ঠা করার আগেই তার মাথায় বত্রিশ কেজি ওজনের একটি বাড়ি মারল গুল মুহাম্মদ। জর্জ ব্লিট্স আস্তে করে ঢলে পড়ে গেলেন। যদি তিনি ব্রেইন হেমারেজের শিকার নাও হয়ে থাকেন অন্ততঃ আগামী ১২ ঘন্টায় তার হুঁশ ফিরবে না। কেননা, নিঃশব্দে রক্তপাত না করে কোনো দানবাকৃতির কমান্ডো গোয়েন্দাকে সুবোধ বালকের মত ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার উপযোগী এ অস্ত্রটি গুল মুহাম্মদের বড়ই প্রিয়। সিল্কের মোজার অর্ধেক পরিমাণ ভেজা বালিতে পূর্ণ করে তৈরি এ অস্ত্র বার কয়েক শূন্যে চক্কর দিয়ে ঠিক মত সই করে টেকো মাথার তালুতে মারলে এর অদ্ভুত গুণাগুণ প্রকাশ পায়। থপ্ শব্দটির পর জর্জ ব্লিট্সকে পড়ে যেতে দেখেই শোল্ডারে রাখা পিস্তলে হাত দিল অপর তিনজন কমান্ডো। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের ভেতর তারেক মাহমুদ ইকোনমি ক্লাস থেকে স্ক্রীনের ফাঁক দিয়ে উপরে তুলে ধরলেন তার অটোমেটিক মেশিনগান। বললেন, যারা পিস্তল হাতে নেয়ার চিন্তা করছেন, তাদের বলছি, অস্ত্র ফেলে দিন। গোটা বিমানটি উড়িয়ে দিতে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করব না। বাঁচতে চাইলে অস্ত্র ফেলে উপরে হাত তুলে দাঁড়ান। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মার্কিনী ও ইসরাইলী কর্মকর্তারা হাত তুলে দাঁড়ালেন। বাবর খান ওদের চারটি পিস্তল নিজের ব্যাগে নিয়ে নিলেন। এরি মধ্যে স্ট্রেচারে রাখা অস্ত্রগুলো হাতে তুলে নিলেন মুজাহিদরা। শাকিল,

ওয়াসীম, বাবর খান গুল মুহাম্মদ, এখন সশস্ত্র। বিস্ফোরকগুলো মাওলানা তারেক মাহমুদের নিয়ন্ত্রণে। আর ককপিটের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মাত্র একজন পাইলট দিয়ে বিমান চালাচ্ছেন নাসির আহমাদ। কো-পাইলটকে যাত্রীদের পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

ইমার্জেন্সী হ্যান্ডমাইক হাতে নিয়ে মাওলানা তারেক মাহমুদ যাত্রীদের আশ্বস্ত করে বললেন, "ভদ্র মহোদয় ও মহিলাবৃন্দ! আমরা ইসলামী জিহাদ গ্রুপের সদস্য। খুব সুপরিকল্পিতভাবে আমরা এ ফ্লাইটটি ছিনতাই করেছি। আমাদের লক্ষ্য পাঁচজন আরব মুজাহিদকে মুক্ত করা। যাদের তিনজন ইসরাইলী কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দী। আর দু'জন আমেরিকার জেলখানায়। এদের আমাদের দাবি মত মুক্তি দিলেই কেবল এ বিমান ছিনতাই ঘটনার অবসান হবে। আর এ কাজের জন্য আমরা বিশেষভাবে জিম্মি করতে যাচ্ছি আমেরিকা ও ইসরাইলের যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি এ বিমানের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছেন তাদের। প্রাথমিকভাবে আমাদের তিন সাথী এদের প্রহরায় থাকবে। তবে এদের মধ্যে যেহেতু বেশ ক'জন সাবেক আর্মি, গোয়েন্দাকর্মী, কমান্ডো ও স্পাই আছেন অতএব, এদের মুক্ত অবস্থায় রাখাটা মোটেও সমীচীন হবে না। তথাপি আমরা সৌজন্যের খাতিরে তাদের মুক্তই রাখবো যতক্ষণ না তারা কোন অসদাচরণ করেন। কোনরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তাদের নাইলনের কর্ড দিয়ে কষে বেঁধে, ডাবল হ্যান্ডকাপ পরিয়ে বিমানের মেঝেতে ফেলে রাখা হবে। আর কেউ সীমালংঘন করলে নির্দ্বিধায় সাইলেন্সারযুক্ত রিভলবার দিয়ে কপালের শিরায় অথবা কানের পেছনে গুলি করা হবে। বাকি সাধারণ যাত্রীদের আমরা কিছুই করব না। আপনারা সন্ত্রস্ত হবেন না। নিশ্চিন্তে থাকুন। মহিলারা কান্নাকাটি বা চিৎকার করবেন না। আপনাদের যাদের হাতে মোবাইল আছে, সব আমাদের লোকের নিকট জমা দিন। চীন থেকে আমরা যোগাযোগ করে পরবর্তী গন্তব্য বা কর্তব্য নির্ধারণ করব। ধন্যবাদ!"

॥ দশ ॥

শ্রীদেবী প্রতিদিনের মত আজও বসে আছে তার বাসার সামনের বারান্দাটায়। একটু পরেই ফরহাদ ভাইয়ের লোকজন এসে তাকে ওষুধপত্র, দিনের বাজার দিয়ে যাবে। আর বিদেশ যাওয়ার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কেও জানাবে তারা। এভাবেই চলছে গত ৫/৬ মাস যাবত। দুনিয়ায় তার আপন বলতে কেউ নেই। স্বামী তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর চাকরিটা নিয়েই পড়ে রইল শ্রীদেবী। ছেলে দুটোকে এক অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেয়ায় এরা এখন শিক্ষিত হয়ে চাকরিতে ঢুকেছে। মাঝে মাঝে ওরা মাকে দেখতে আসে ঠিকই কিন্তু সুইপার কলোনীর বাসায় ওদের ইচ্ছে করেই থাকতে দেয় না শ্রীদেবী। এতে ছেলেদের মন ছোট হয়ে যাবে। ওরা যেহেতু মা-বাবার পরিচয় ছাড়াই দুনিয়াতে বেড়ে ওঠছে তো আর কী দরকার তাদের মায়ায় অথবা পংকে জড়িয়ে। এরি মধ্যে তার বাসার সামনে একটি মাইক্রোবাস এসে থামল। নেমে এলেন ফরহাদ ভাই। বললেন, "বোন আমার শোন! তোমার ছেলেদের কাছেই তোমাকে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। তুমি এখনই আমার সাথে চল, পরে তোমার যা যা দরকার আমি পাঠিয়ে দেব। তুমি এখনই গাড়িতে গিয়ে বস, আমার একটু তাড়া আছে।" বিদেশ যাওয়ার কথা শুনে শ্রীদেবী আগেই মোটামুটি তৈরিই ছিল, এরপরও টুকটাক কাজ সেরে ঘরে তালা দিয়ে ২০ মিনিটের মধ্যে গাড়িতে এসে বসল।

আধ ঘন্টার মতো গাড়ি চলার পর মাইক্রোবাস এসে থামল একটি হোটেলের সামনে। লাউঞ্জেই সোফায় বসা ছিল শ্রীদেবীর বড়পুত্র অশোক। অশোক এগিয়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "বস মা তুমি গাড়িতেই বস। আমিও রওনা হওয়ার জন্য তৈরি। আমার লাগেজ নিয়ে আসি।" একটু পরেই গাড়িতে করে অন্য এক শহরের পথে রওনা হল শ্রীদেবী তার পুত্রের সাথে। যেখানে তাদের নতুন এপার্টমেন্টে অপেক্ষায় রয়েছে ছোটপুত্র অজয়। চিকিৎসা বাবত প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্য, জিহাদ গ্রুপের ডোনেশন, শ্রীদেবীর নাম, কাগজপত্র, স্পীকারের চিঠি ইত্যাদি ব্যবহারের বিনিময়ে প্রদেয় অর্থ সাহায্য সব মিলিয়ে ১ লাখ ডলারের ক্যাশ এখন তাদের এপার্টমেন্টে পৌঁছে দেবেন ফরহাদ ভাই। অশোক আর অজয় তাদের মা-সহ বসবাস করবে এই শহরে। নতুন জীবন, নতুন পরিচয় আর নতুন জগত

নিয়ে। আয়েশা আখতার, আবদুল্লাহ আর আতাউল্লাহ, এখন এই শহরের নতুন বাসিন্দা। ছেলেরা তাদের ফরহাদ মামাকে কোনদিন ভুলবে না। যিনি তাদের শৈশব থেকে আজো পর্যন্ত পাশে রয়েছেন একজন দেবতার মত। মা শ্রীদেবী, এখন যিনি আয়েশা আখতার তিনি তো তার ফরহাদ ভাইকে দেবতার চেয়েও বড় মনে করেন। কিন্তু ফরহাদ মামা খুব শক্তভাবে মানা করেছেন তাকে এসব দেবতা টেবতা বলতে। তিনি বলেছেন, "তোমরা আমাকে দেখে কেবল বুঝতে চেষ্টা কর যে, একজন ঈমানদার মানুষের কেমন হওয়া উচিত। শত গুনাহ, অপারকতা আর সীমাবদ্ধতায় বাঁধা এই আমি কেবল একজন প্রকৃত মুমিন হওয়ার চেষ্টাই করে যাচ্ছি জীবনভর। ওরা যখন নতুন ঠিকানায় পৌঁছুলো মামা তখন ফোন করলেন অশোকের মোবাইলে। বললেন, তুই ডলারগুলো হেফাজতে রাখিস। তোদের দুইভাইয়ের নামে একাউন্টে জমা রাখবি এসব। আর তোর মায়ের চিকিৎসার জন্য আগামী মাসে মাদ্রাজের এক হসপিটালে আমি সিরিয়াল দিয়ে রেখেছি। তোরা কিচ্ছু ভাবিসনে। আল্লাহ হাফেজ!"

॥ এগার ॥

ফেমাস মটর ড্রাইভিং স্কুলের পেছনকার এক গ্যারেজে পাল্টে ফেলা হয়েছে 'পার্লামেট ক্লিনিক এম্বুলেন্স' লেখা সাদা গাড়িটির রঙ। এটি এখন অন্য আরেক গাড়ি। সকালে যখন রামচরন এটি নিয়ে 'অস্ত্র ও বিস্কোরক' চালান করছিল তখন এর নাম্বারও ছিল ফল্‌স। আর শ্রীদেবী বলে কেউই যায় নি আজকের ফ্লাইটে। তিনদিনের ছুটিতে থাকা ড্রাইভার হরিচরণ এখন একটা লম্বা ঘুম দেবে। একটু পরই তো আবার টিভির সামনে বসতে হবে বিমান ছিনতাইর খবরাখবর শুনতে।

বিমান ছিনতাই ঘটনা শুরুর দশমিনিটের মধ্যে ফরহাদ ভাইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জিম্মি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সকল আত্মীয়- স্বজন ও বন্ধু মহলের ঠিকানায় টেলিফোন, ই-মেইল ইত্যাদি মারফত শত শত মেসেজ পাঠাতে শুরু করলেন ড. আহমদ সাইফুল্লাহ।

এতে কেবল বলা হচ্ছে, "আপনার এ আত্মীয়কে বাঁচাতে হলে হোয়াইট হাউজ ও তেল আবিবকে ইসলামী জঙ্গীদের দাবী দ্রুত মেনে নেয়ার জন্য চাপ দিন।"

কন্ট্রোল টাওয়ারের সাথে প্রথম যোগাযোগ করেন তারেক মাহমুদ। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তাদের দাবির কথা। এরপর একে একে কথা বললেন হাফেজ জিয়াউল হাসান, ফরহাদ ভাইসহ সংশ্লিষ্ট সকল মুজাহিদের সাথে।

বিমান এখন চীনের একটি প্রাদেশিক এয়ারপোর্টে অবতরনের জন্য তৈরি হচ্ছে। মাওলানা তারেক মাহমুদ একটু উদ্বিগ্ন। কেননা, ইসরাইল ও আমেরিকার কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাথে তার এখনও কথা হয়নি। চীনা কর্তৃপক্ষের সাথেও কথা হয়নি মুজাহিদদের। যদি কোনো পক্ষ অবস্থার নাজুকত্ব না বুঝে কোনোরূপ বোকামি করে বসে তবে তো বিমানটি উড়িয়ে দেয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো বিকল্প থাকবে না। কিন্তু তারেক মাহমুদরা তো এটা চাননা। তারা চান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের মুক্তি। এটা না হলে তো ১৩০ জন মানুষসহ নিজেদের এ আত্মবিসর্জনও কোনো ফল দেবেনা। তার ভাবনার সূত্রটি কেটে গেল ককপিট থেকে নাসিরের ডাকে। হোয়াইট হাউজের প্রতিনিধি কথা বলতে চায় তারেক মাহমুদের সাথে। তারেক মাহমুদ সরাসরি সব বলে দিলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এখানে চাপ বাড়ানোর জন্য এবং তাদের কর্ম তৎপরতার সিরিয়াসনেস প্রমানের জন্য তিনি ছোট্ট একটা বাকচাতুর্যের আশ্রয় নিলেন। যা জিহাদী প্রশিক্ষণের সময় বুদ্ধি ও মেধার উন্নয়ন কোর্সে হযরত শায়খ তাদের শিখিয়ে ছিলেন। যা মূলত হযরর কাসেম নানুতুভী (রহঃ)- এর আচরিত কৌশলেরই অনুসরণ ।

তারেক মাহমুদ বললেন, "আমাদের সাথে সীমালংঘনের চেষ্টা করায় আপনাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন এখন বিমানের মেঝেতে নিঢাল হয়ে পড়ে রয়েছে। আপনারা তাকে গ্রহন করতে চাইলে চীনকে অনুরোধ করতে পারেন।"

এখানে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে থাকা জর্জের কথা বুঝাতে চাইলেও হোয়াইট হাউজ মনে করল যে তারা একজনকে হত্যা করেছে। সুতরাং অন্যদেরও তারা হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। এরপর ওয়ারলেসে কথা বলতে দেয়া হল একজন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারীকে। তিনি কথা শুরু করামাত্রই আগের পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ অনুযায়ী বাবরখান আর শাকিল আর্ত চিৎকার শুরু করে দিল। যেন কঠিন মারপিট করা হচ্ছে তাদের। ওয়ারলেসে

এসব শুনে হোয়াইট হাউজের আর মাথা ঠিক রইলনা। ওরা বলল, আচ্ছা আমরা দু'ঘন্টার মধ্যে আপনাদের দাবির বিষয়ে আমাদের মতামত জানাব। কিন্তু এরমধ্যে আপনারা আর কাউকে হত্যা বা নির্যাতন করবেন না। আর আমরা চীনা কর্তৃপক্ষকে বলেছি, তারা যেন আপনাদের পথে কোনো বাধা সৃষ্টির চেষ্টা না করে। তারেক মাহমুদ মনে মনে বললেন, এই তো চাই।

ওয়াসীম আর গুল মুহাম্মদ এরিমধ্যে বিমানের অসুস্থ ও নার্ভাস রুগিদের একটি জরিপ সেরে নিয়েছে। এ রকম ১৫ জনকে তারা চীনে নামিয়ে দেবে। যেন বিশ্ববাসী তাদের সততা, উদারতা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে পারে। এরিমধ্যে একটি মেসেজ হযরত শায়খে আকবরের তরফ থেকে এ মর্মে এসেছে যে, যদি প্রয়োজনে দু'একজনকে হত্যা করতে হয় তাহলে সি আই এ'র কর্মকর্তা এবং তিনজন ইহুদীকে প্রাধান্য দেবে। যাদের বিরুদ্ধে মুসলিম নারী-শিশু ও ফিলিস্তীন ও ইরাকের মুক্তিযোদ্ধা হত্যার প্রমাণিত অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া যদি যুদ্ধ বাধিয়ে কেউ মরতে আসে তাহলে তাকেও মেরে ফেলা যাবে। কিন্তু নির্দোষ যাত্রীদের গায়ে একটি টোকাও যেন না পড়ে। শুধু তাই নয় তাদের যেন ভীতি বা হুমকিও না দেয়া হয়। তারা যেন অস্বাভাবিক উৎকন্ঠায়ও না থাকে। ছোট শিশুদের সাথে হাসিখুশী থাকবে। ওদের কোলে নেবে। খেলনা উপহার দেবে। যা স্ট্রেচারের নীচে একটি ব্যাগে রাখা আছে পাউরুটি, কলা, চানাচুর আর শুকনো ফলের ব্যাগগুলোর সাথে। এসবই যাত্রীদের মাঝে সময় সময় বণ্টন করবে। এসব বিষয় প্রশিক্ষণের সময়ই শেখানো হয়ে থাকলেও পুনরায় হেডকোয়ার্টার্স থেকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে নার্ভাস হয়ে কোন অপারেটার অন্যায় কোন আচরণ না করে বসে। টেনশানের ফলে যেন কেউ অস্বাভাবিক না হয়ে ওঠে এ জন্যে নাসির আহমদ সকলকে ওজুর সাথে জিকিরে মশগুল থাকতে বলে দিয়েছেন।

তারেক মাহমুদের মনে হঠাৎ একটা খেয়াল এলো যে, এই এয়ারপোর্টে নামাটা ঠিক হবে না। তৎক্ষণাৎ তিনি নাসিরকে ডেকে বললেন, "পাইলটকে বল, বিমান আরও ৮২ কি.মি. উত্তরের পর্যটন শহরে নিয়ে যেতে। সেখানকার এরোড্রামে ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিং করাও। এবং পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে আমরা পছন্দ করব দুবাইকে। পথে আমরা ভারত ও পাকিস্তানের

দুটো এয়ারপোর্টে থেমে যেতে চাই, কেবল প্রচারণা ও আলোড়নের জন্য। পাশাপাশি এসব দেশের সরকারের আচরণও আমরা পরখ করতে চাই। ভবিষ্যতে যাতে তাদের ব্যাপারেও আমরা এর আলোকেই কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারি।” তারেক মাহমুদ হয়ত ভেবেছিলেন যে, চীনা এই এয়ারপোর্টে কোনরকম কমান্ডো অভিযান বা বাধার সৃষ্টি হতে পারে। অতএব, তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে থাকতে চান। পর্যটন শহরের ওই ছোট্ট এরোড্রামে এসবের কোনোই সম্ভাবনা নেই।

॥ বার ॥

ফরহাদ ভাই এখন তার ঘড়ি মেরামতের দোকানে বসে লোকজনের মুখে বিমান ছিনতাইয়ের কথা শুনছেন। টিভি ও রেডিওর খবরে না কি বলা হয়েছে “ছিনতাইকারীরা বেশ ক’জনকে হত্যা করেছে এবং হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধি ছিনতাইকারী দলনেতার সাথে কথা বলার সময় বিমানের ভেতর ব্যাপক কান্নাকাটি ও আর্তচিৎকারের শব্দ শুনেছেন বলে জানা গেছে।” বোকার মত তিনি নানাজনকে নানা কথা জিজ্ঞেস করেন, আর বকা খান। কেউ বলে, আরে মিয়া আপনি আপনার কাজ করেন। এসবের খবর নিয়ে আপনার কী লাভ! এসব শুনে ফরহাদ ভাই নীরবে কেবল আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকেন। যেন কেউই তাকে কোনরূপ সন্দেহ না করে। তাছাড়া, একটা বিষয়ে তিনি খুবই নিশ্চিন্ত যে, শ্রীদেবী দীর্ঘদিনের ছুটিতে থাকায় তাকে তার পরিচিত কেউই সহসা খুঁজবে না। আর স্পীকারের পত্রের সুবাদে এই ফ্লাইটে সে ভ্রমণ করছিল এবং ছিনতাইয়ের কবলে সেও পড়েছে এ বিষয়টি যদি আলোচনায় এসেও যায় তথাপি তাতে ফরহাদ ভাইকে জড়ানোর কোনো যুক্তি নেই। কারণ যারা বিষয়টি জানে তাদের পক্ষ থেকে ক্ষতির কোনো আশংকা নেই। আর যারা কিছুই জানে না, তারা এ নিয়ে মাথাও ঘামাবে না। তাছাড়া, শ্রীদেবী বলতে তো এ দুনিয়ায় এখন কেউ নাইও। এখন আছেন আয়েশা আখতার। কায়দা করে কেবল তার মুক্তির একটা নিউজ করিয়ে অথবা তার মৃত্যুর একটা বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারলে সারা জীবনের জন্য এ প্রসঙ্গটির ইতি ঘটবে। আর অশোক অজয়কে দিয়ে তার চাকুরির পাওনা দাওনাগুলোও নিঃশেষে আদায় করে নেয়া যাবে। ফরহাদ ভাই

মনে মনে বললেন, ঝামেলাটা একটু কমুক, এরও একটা পথ আল্লাহই বের করে দেবেন।

পর্যটন শহরে বিমান ল্যান্ড করল। খুব দ্রুত বাছাই করা ১৫ জন যাত্রীকে নামিয়ে দেয়া হল মাটিতে। এদের মালামালও দিয়ে দেয়া হল। প্রত্যেককে হাত খরচের জন্য ৫০০ ডলার করে দিলেন তারেক মাহমুদ এবং বললেন, "অনিচ্ছাকৃত এ কষ্ট দেয়ার জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আজ এসব করতে হচ্ছে। মার্কিনী ও ইসরাইলীদের অত্যাচার, দস্যুতা আর সীমালংঘন সংগ্রামী মুসলিম তরুণদের এ পন্থায় এগুতে বাধ্য করছে। আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পাঁচ নেতার মুক্তির জন্য এ কাজ করেছি। আপনাদের মঙ্গল হোক।"

অনতিবিলম্বে বিমান আবার উড়ল। এবার যাবে দুবাই। পথে ভারতের শ্রীনগর আর পাকিস্তানের করাচি বিমানবন্দর হয়ে। উড্ডয়নের পরপরই শাকিল, ওয়াসীম আর গুল মুহাম্মদের তত্ত্বাবধানে কেবিন ক্রুরা বিমানের প্যাসেঞ্জারদের খানা বিতরণ করতে শুরু করল। খাবার শেষে সকলকে বলা হল বিশ্রাম ও ঘুমের চেষ্টা করতে। এ কথাও বলে দেয়া হল যে, আমাদের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি না করলে আমরা যাত্রীদের কোনই ক্ষতি করব না। আর আমাদের দাবি পূরণে সমস্যা সৃষ্টি না করলে আমরা মূল জিম্মিদেরও কোনো ক্ষতি করব না। অন্যথায় বিমান উড়িয়ে দেয়া হবে। অতএব, আপনারা নিজেদের স্বার্থেই সংযত ও স্থির থাকুন। মিডিয়ার সাথে আমরা যাদের কথা বলার সুযোগ করে দেব তারা নিঃসংকোচে সব বলতে পারেন তবে একটা কথা বলতে ভুলবেন না যে, দাবি পূরণ ছাড়া এরা আর কিছুতেই দমবে না। এবং এত নিখুঁত, সাবলীল আর অকম্প হাতের বিমান ছিনতাই কল্পনাও করা যায় না। এমন নির্ভুল পরিকল্পনা আর নিষ্ঠাপূর্ণ বাস্তবায়নও নজিরবিহীন। এভাবে সুন্দর করে বলবেন। যাতে পৃথিবীর মানুষ আন্দাজ করতে পারে যে, জিহাদী কার্যক্রমে যুক্ত তরুণেরা এখন কতটা দক্ষ আর আদর্শিক দিক দিয়ে এরা কত উন্নত। এরপর সকল মুজাহিদ পর পর ভিন্ন দুই জামাতে জোহর আদায় করলেন'।

বিমান ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত প্রতিটি মুজাহিদ বিমানে চড়ার সময় ভিন্ন ব্যক্তির নাম, পরিচয়, ঠিকানা এমন কি মেকাপ ব্যবহার করলেও

ছিনতাইপর্ব শুরুর সাথে সাথে তারা মুখোশ পরে নেন। শুধু মাওলানা তারেক মাহমুদই নিজের স্বাভাবিক পোশাকে মুখোশহীন আছেন। বাকিরা সবাই মুখোশধারী। এদিকে ঘটনার শুরুতেই বিশ্বের গণমাধ্যম এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক প্রচরণা চালায়। হায়দার খান ফরহাদ ভাইয়ের নির্দেশনানুযায়ী কতিপয় রিপোর্টার ও ভাষ্যকারের অসর্তকতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তিকর ও অতিরঞ্জিত সংবাদ পুশ করছিলেন। এখন বিভিন্ন চ্যানেলের সংবাদ শুনে মুজাহিদ নেতাদের দারুণ হাসি পাচ্ছে, কত টিভি যে কতরকম সংবাদ দিয়ে চলেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

॥ তের ॥

বিমান এখন শ্রীনগরের আকাশে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমেরিকা ও ইসরাইলের অনুরোধে ছিনতাইকারীদের বিষয়টি গভীরভাবে ঠাণ্ডামাথায় পর্যবেক্ষণ করছে। কোনরূপ গোলমাল ভারত এ জন্যে করবে না যে, মুজাহিদদের অহেতুক ঘাটালে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। বিপদ যাচ্ছে পরের উপর দিয়ে যাক। অন্যের মড়া নিজে টানার দরকার কী! শ্রীনগরে বিমান ল্যান্ড করার আগে অবশ্য তারেক মাহমুদ জিহাদী গ্রুপের নিজস্ব চ্যানেলে খবর পেয়েছেন যে, সত্যিই শ্রীনগরে ভারতীয় আর্মি কোনো প্রতিরোধ বা কমান্ডো হামলার ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ওরা যে কোনো উপায়ে সহজে আপদ বিদায় করতে চায়।

শ্রীনগরে বিমানটি নামার সাথে সাথে এর চারপাশ থেকে ভারতীয় সকল লোকজন সরে যায়। ফুয়েল ট্যাংকারগুলোও সরিয়ে নেয়া হয় বহুদূর। এয়ারপোর্টের ইন্টারনাল স্টাফরা নিরাপত্তার জন্যে ভবনে আশ্রয় নেয়। কেবল কন্ট্রোল টাওয়ার থেকেই কথাবার্তা চলে ওয়ারলেসে মাওলানা তারেক মাহমুদের সাথে। মাওলানা তারেক ও নাসির আহমাদ স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপী মিডিয়ার প্রতিনিধিদের একটি সাক্ষাৎকার দেন শ্রীনগরে বসে। এতে তিনি একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো ছাড় দেব না। তাছাড় কোনরকম চালাকি করলে চরম ব্যবস্থা নেয়া হবে। শ্রীনগর থেকে বিদায় হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে কন্ট্রোলকে তিনি বললেন, এয়ারপোর্ট ভবনের উত্তর-পশ্চিম

কোণের বাগানে ৩টি বড় বস্তা আর পানির ৪টি কন্টেইনার রাখা আছে বিনা কোনো তল্লাশি বা তদন্তে এসব যেন অতিদ্রুত বিমানের দরজার পাশে রেখে বাহকরা ২০০ গজ দূরে সরে যায়। যদি এ কাজটি করা না হয় তাহলে একজন ইসরাইলীকে গুলি করে শ্রীনগরের রানওয়েতে ফেলে দেয়া হবে। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি হন্তদন্ত হয়ে এসব কাজ খুব সহজেই করে দিল। বাহকরা দৌড়ে দূরে সরে যাওয়ার পরপরই বিমানের ইমার্জেন্সী একজিট খুলে শাকিল আর ওয়াসীম বস্তা ও কন্টেইনারগুলোতে রোপ লাগিয়ে আবার বিমানে ওঠে গেল। কমান্ডো ট্রেনিং থাকায় চোখের পলকে তারা এ কাজটি করল। দূর থেকে শত শত ক্যামেরার লেন্স তাদের আলোকচিত্র ধারণ করল। মুভি ক্যামেরা তাদের দক্ষতা দেখালো। এরপর পন পন করে রোপগুলো টেনে তুলে নেয়া হলো বিমানের ভেতর। খাদ্য ও পানীয় তুলে নেয়ার পর দরজা বন্ধ করে বিমান আবার ছুটে চললো করাচির পথে।

কয়েকঘন্টা পর জর্জ ব্লিট্সের জ্ঞান ফিরেছে। নাসির তাকে একটা কোল্ড ড্রিংকস খেতে দিয়ে অন্য একজনকে ইশারায় বললেন, তাকে বিমান ছিনতাই সম্পর্কে ব্রিফ দেয়ার জন্যে। এরই মধ্যে যাত্রীদের হালকা নাশতা ও কফি দেয়া হলো। ইসরাইলী ও মার্কিনীরাও শান্তভাবে বসে নাশতা খাচ্ছে। মুভিতে তখন মুজাহিদ গ্রুপের ইতোপূর্বেকার অন্যান্য বিমান ছিনতাই ঘটনার বিস্তারিত দৃশ্যাবলী দেখানো হচ্ছে। টিভি স্ক্রীনে খুব মনযোগ দিয়ে সেসব দেখছে যাত্রীরা। একজন যাত্রী জনৈক মুজাহিদকে তার এটাচী কেস দিয়ে আঘাত করার সময় অপর মুজাহিদ কী করে সে যাত্রীটিকে মার দিয়ে কাবু করে। অপর এক যাত্রী নামাজরত একজন মুজাহিদকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চেষ্টা করলে নিঃশব্দ পিস্তল দিয়ে তাকে কেমন নিখুঁতভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এসব দেখে যাত্রীরা হতবিহ্বল। এমনি সময় তারেক মাহমুদ বললেন, সাথীরা, সবাই আসরের নামায পড়ে নাও! এখন ওয়াক্ত প্রায় শেষের দিকে। এবারও দুই ভাগে তারা জামাতের সাথে আসর পড়ে নিলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

করাচির পথে ওড়ার সময়ই হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধি রিং করলেন তারেক মাহমুদের নাম্বারে। তারেক মাহমুদ বললেন, আপনারা কী সিদ্ধান্ত নিলেন? ২ ঘন্টার জায়গায় ৫ ঘন্টা হল কেন? আমরা কিন্তু দুবাই পৌছেই একে একে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা শুরু করব। আমাদের বহু লোক আপনারা হত্যা করেছেন। অসংখ্য মানুষ এখনও অত্যাচারিত হচ্ছে আপনাদের হাতে। গোটা বিশ্বমুসলিম আজ আপনাদের বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার। একটু কঠোর ভাষায়-কথাগুলো বলে তারেক মাহমুদ থামতেই ওই পক্ষ বলল, ওয়াশিংটন ও তেলআবিব একমত হয়ে আপনাদের জানাচ্ছে যে, আজ রাত ১২টার মধ্যে আপনাদের দাবি অনুযায়ী সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে। এখন আপনারা বলুন কীভাবে কোথায় তাদের আমরা পৌঁছে দেব, আর আপনারাই বা আমাদের বন্দীদের কীভাবে ছাড়বেন? তারেক মাহমুদ অত্যন্ত ধীর ও শান্ত-কন্ঠে বললেন, জেরুজালেম শহরের ব্রাহিমী স্কোয়ারে আয়োজিত সমাবেশে আটক তিনজন মুজাহিদ নেতাকে এনে ছেড়ে দিতে হবে। মুসলিম তরুণরা তাদের গাড়িতে করে নিরাপদ স্থানে পৌছার পরবর্তী ৬ ঘন্টা পর সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা তাদের সাথে কথা বলার পর আমরা জিম্মিদের মুক্তি দেব। আমেরিকায় বন্দী দুই শায়খকে মিসরগামী প্যাসেঞ্জার বিমানে তুলে দিতে হবে। ওরা ৬ ঘন্টা ফ্লাই করার পর সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে আমাদের সাথে আলাপ-সালাপ করার পরই আমরা বিমানের সকল আরোহীকে মুক্ত করে দেব। আর ২ ঘন্টার স্থলে যোগাযোগ করতে ৫ ঘন্টা লাগায় আমরা আমাদের দাবির সাথে নতুন এ শর্ত জুড়ে দিচ্ছি যে, বন্দীদের প্রত্যেকের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লাখ ডলার করে ১০ লাখ আর বিমান ছিনতাই ব্যয় এবং সকল জিম্মির নিরাপত্তা বাবদ ১০ লাখ, সর্বমোট ২০ লাখ ডলারের ক্যাশ মিসরগামী শায়খদের হাতে দিয়ে দিতে হবে। তারেক মাহমুদের সুস্পষ্ট ও অকম্প বার্তা শুনে ওইপক্ষ তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়ে গেল। কেননা, বল এখন মুজাহিদদের কোর্টে। মার্কিনীরা কোনো গুয়ার্তুমি করলেই শর্ত আরও কঠিন হতে থাকবে।

কথাবার্তা শেষ হতেই তারেক মাহমুদ বললেন, সাথীরা মাগরিবের পর আমরা একটু পরামর্শে বসতে চাই। কেবল একজন থাকবে প্রহরায়, বাকি

সবাই তিনচার মিনিটের জন্য বিমানের পেছনভাগে স্টোর সেকশানে চলে আসবে। যাত্রীগণের উদ্দেশ্যে বলছি, আর ৮ ঘন্টার মধ্যেই আমরা সম্ভবত বিমানটি মুক্ত করে দেব। আমাদের দাবি প্রতিপক্ষ মেনে নিয়েছে। এখন থেকেই তা পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেরুজালেম ও নিউইয়র্কে এখন মুক্তিপর্ব চলছে। ৬ ঘন্টার একটি সেফটি টাইম আমরা বেধে দিয়েছি যেন কোন বন্দীকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়ে নামমাত্র মুক্তি দেয়া না হয়। এরা যেন সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় কারাপ্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসেন। আর ইন্টারকমে ক্যাপটেনকে বললেন, করাচি বা দুবাইয়ে নামার প্রয়োজন নেই। আপনি সরাসরি শারজা চলে যান। ওখানেই আমরা জিম্মিদের দেড়ে দেব। এরপর বিমানটি নিয়ে যাওয়া হবে কুয়েত। কুয়েত থেকে আমার মুজাহিদরা নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছার পর সব শর্ত তুলে নেয়া হবে, এর আগে নয়। ইন্টারনেটে আবুধাবীতে কর্মরত রেড ক্রস সোসাইটিতে খবর দেয়া হল, তারা যেন জিম্মিদের গ্রহণ করতে গভীর রাতে শারজার বুর্জ আল খালীজে পৌঁছে যায়। ইচ্ছে করলে মার্কিন কূটনীতিকরাও সেখানে হাজির থাকতে পারেন। তবে কূটনীতিকদের উপর আল-কায়দা বা অন্য কোন স্থানীয় আরব মুজাহিদ গ্রুপের হামলা হলে এর দায়দায়িত্ব আলোচ্য জিহাদ গ্রুপ নিবে না।

সারা পৃথিবীর মানুষ উদগ্রীব হয়ে আছে চাঞ্চল্যকর বিমান ছিনতাইয়ের শেষদৃশ্য দেখার জন্যে। সংবাদ মাধ্যম বারবার তথ্য চেঞ্জ করতে করতে এখন প্রায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কেবল আল-জাজিরা চ্যানেলেই সরাসরি মুজাহিদদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অডিও বা ভিডিও প্রচার করছে। ফরহাদ ভাই এরিমধ্যে তার শহরের সর্বাপেক্ষা বড় মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর এমডিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কিডন্যাপ করার ব্যবস্থা করে কাজ হাসিল করে ফেলেছেন। গত ২০ মিঃ আগে তাকে হোটেল শেরাটনের লাউঞ্জে এনে পুলিশ ও সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে দেয়া হয়। মি. হাডসন খুবই সন্ত্রস্ত চেহারা নিয়ে ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছেন তার কাহিনী। "অফিস থেকে ফেরার পথে আমার গাড়ির সীটের পেছনে ঘাপটি মেরে থাকা একজন লোক আমার ঘাড়ে পিস্তল ধরে বলে, ড্রাইভারকে বলুন, এভারেস্ট হাউজিং এস্টেটের ৩ নং সেক্টরের ১৫ নং সড়কের ২ নং বাড়িতে যেতে। নয়তো ৬ টা গুলিই আপনাদের দু'জনের উপর করব। কোনরূপ চালাকি করবেন না।

ড্রাইভারকে এই লোকটির কথামত গাড়ি চালাতে বলে আমি ভাবতে লাগলাম, হঠাৎ এ কোন্ বিপদে পড়ে গেলাম আমি? তখনই লোকটি বলল, আপনি ইচ্ছে করলে মাত্র একটি ফোন করেই এ বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আমি গাড়ি থেকে আস্তে করে নেমে যাব আর আপনি গাড়ি নিয়ে সোজা বাসায় চলে যাবেন। মি. হাডসন বললেন, টেলিফোনে আমার কাকে কী বলতে হবে বলুন। আমি হার্টের রুগী। টেনশান সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া আমার এক শ্যালক চলাচল বিমান ছিনতাইয়ে জিম্মি হয়ে আটকা পড়েছে। এ জন্য আমরা পারিবারিকভাবে খুবই উদ্বিগ্ন।

তখন সুন্দর চেহারার ও নম্র স্বভাবের লোকটি বলল, আপনি আপনার সেল ফোন কোম্পানীর ম্যানেজার অপারেশনকে বলুন তার টেবিলে রাখা গোলাপী খামের ভেতরকার নাম্বারগুলোর সকল কল নাম্বার, মেসেজ ও কানেকশানের রেকর্ড যেন এই মুহূর্তে মুছে দেয়া হয় এবং এসব নাম্বার বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফল্স নাম ও ঠিকানায় নেয়া এসব ফোনের সংযোগ আমরা এখন থেকেই বাদ করে দিতে চাই। এমডি মি. হাডসন এ নির্দেশ দেয়া মাত্রই ১০ মিনিটের মধ্যে তা কার্যকর হল। ওপাশ থেকে শিওর হওয়ার পর কিডন্যাপার হাফেজ মমতাজ পিস্তলের গুলিগুলো খুলে পকেটে ভরে নিলেন। আর পিস্তলটি গাড়িতে ফেলে রেখেই ড্রাইভারকে বললেন হোটেল শেরাটনের লাউঞ্জে চল, সেখানে এমডি সাহেবকে সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় জনসমক্ষে পেশ করে আমি চলে যাব। সাংবাদিক মহল ও পুলিশকে আগেই এ খবর দেয়া হয়েছে। তারা অপেক্ষায় আছে। গাড়ি শেরাটনের মোড়ে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়লে একটি মোটর সাইকেল এসে গাড়িটি ঘেঁসে দাঁড়াল। হাফেজ মমতাজ গাড়ির দরজা খুলে মোটর সাইকেলের পেছনে বসলেন। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল তাকে বহনকারী বাইকটি। মমতাজ যখন ফরহাদ ভাইয়ের কাছে বসে ঘটনার বিবরণ শুনাচ্ছিল তখন মি. হাডসন শেরাটনে বসে এ কাহিনী বর্ণনা করছিলেন আর পাশের সোফায় একটি মেডিকেল টিম তার স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে গবেষণা করছিল। এখনই তাকে হাসপাতালে নিয়ে জরুরি কিছু চেকআপ করাতে হবে বলে তাদের ধারণা। কিন্তু মি. হাডসন তখন কবুতরের মত কাঁপছেন এবং কান্নাভেজা কণ্ঠে বলছেন, আমি বৃটেনে ফিরে যাব। এ দেশে আর ব্যবসা

করব না। ঈশ্বর আমাকে এবার প্রাণে রক্ষা করেছেন। সামনে ওরা আমাকে আর রাখবে না। এসব শুনে শেরাটনের টি-বয় রাধারমণ বলল, "স্যার, বিমানে চড়াও তো এখন নিরাপদ নয়। ওখানেও তো মুজাহিদরা পৌঁছে গেছে। বৃটেনেও এখন নিরাপত্তা কোথায়? মুসলমানদের উপর যতদিন পশ্চিমারা অত্যাচার বন্ধ না করবে ততদিন তারা আর নিরাপত্তা ফিরে পাবে না। দিনদিনই কেবল বাড়তে থাকবে প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম। অধিকার আদায়ের যুদ্ধ।" মি. হাডসনসহ সেখানে উপস্থিত অফিসার, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিকরা রাধারমণের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল। এসব কথা তাকে কে শেখাল? সামান্য এক টি-বয়ের বয়ের একি কথা আজ শোনা যায়? ওরা কিন্তু জানে না যে, রাধারমণ ফরহাদ ভাইয়ের একজন রিক্রুট। হরিচরণ আর শ্রীদেবীর মত সহস্র বন্ধুর একজন। শেরাটনে কর্মরত বলেই নামটি তার প্রকাশ্যে বদলান হয়নি। নয়ত গত ৬ বছর ধরেই তো সে রহমতুল্লাহ।

॥ পনের ॥

প্রত্যাশিত সময়েই বিমান শারজা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল। এখন থেকে আরও ৮ ঘন্টা সময় মুজাহিদদের এখানেই এ অবস্থায় কাটাতে হবে। একটু আগে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শেষ করে তারেক মাহমুদ একটু নিশ্চিন্ত হলেন। তার ধারণায় মার্কিনীরা গত সময়টা এভাবে সবকিছু মেনে নিয়ে এবং ইসরাইল ও মার্কিন জিম্মিরা সুবোধ বালকের মত আচরণ করে যেভাবে ছিনতাই ঘটনার অবসান ঘটাতে যাচ্ছে, এটাতো তাদের স্বভাব নয়। ইহুদী-নাসারারা তো সাধারণত এমন সুবোধ হয় না। মুজাহিদদের হাতে পড়ে তারা এখন যদিও একটু নমনীয়, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা পাল্টা ছোবল হানবে। আঘাতটা কোনদিক থেকে কখন আসবে সেটা চিন্তা করে একটু নীরব হয়ে গেলেন তারেক মাহমুদ। নাসির ও বাবর খানও বিষয়টি নিয়ে ভাবল। এখন আবার স্যাটেলাইট ফোন ছাড়া তাদের হাতে আর কোন যোগাযোগ মাধ্যম নেই। কেননা, ওয়ার্ল্ড রোমিং সেল ফোনগুলো ইতোমধ্যেই বাতিল করে দেয়া হয়েছে। অপারেশনের সময় তারা কখনোই আমিরুল মুজাহিদীন শায়খে আকবরের সাথে যোগাযোগ করে না। হাফেজ

জিয়াউল হাসান বা ফরহাদ ভাইয়ের সাথেও গত কয়েক ঘন্টা যাবত যোগাযোগ নেই। বুদ্ধি-পরামর্শ এখন আর বাইরে থেকে পাওয়া যাবে না। যা করতে হয় নিজেদের মাথা থেকেই করতে হবে। ইশার পর গুল মুহাম্মদ যাত্রীদের খানার ব্যবস্থা করতে লাগল। একজন মহিলা যাত্রী হতাশা ও আতংকে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে গুল মুহাম্মদের হাত কামড়ে ধরল। শাকিল, ওয়াসীম ও অন্য ক'জন যাত্রী মিলে তাকে নিবৃত্ত করলেন। একসময় মহিলাটি অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ল। প্রাথমিক চিকিৎসার এইড বক্স নিয়ে এলেন একজন প্যারামেডিক্স।

মহিলার সফর সঙ্গী লোকেরা একটু দূরে দূরে সরে থাকছে। গুল মুহাম্মদ শাকিলকে বললেন, ডাক্তারের সাথে তুমিও রুগিনীর সেবায় থাক। তন্দ্রালু অবস্থায় মহিলাটি বকছে। হিন্দি কথা শুনে শাকিলের কেন জানি মায়া হচ্ছে এ রুগিনীর প্রতি। পিতা, মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন হারা এই তরুণ আকস্মিকভাবে নষ্টালজিয়ার শিকার হতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর রুগী যথেষ্ট সুস্থ হয়ে সীটে বসলে বিমানের ভেতরকার পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।

স্যাটেলাইট ফোনে তারেক মাহমুদ মুক্তিলাভকারী ৫ নেতার সাথেই কথা বললেন। ঠিক ৬ ঘন্টা পর শর্ত অনুযায়ী পূণরায় তাদের সাথে কথা হল। তারা সুস্থ আছেন এবং মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত নিরাপদ অবস্থানে রয়েছেন। এ কথা শেষ হবার পর নিজেদের দাবি আদায়ের সংবাদ দিয়ে, যাত্রীদের কষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তারেক মাহমুদ ছিনতাই ঘটনার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। ৪ টি গ্রুপে শারজা কর্তৃপক্ষের হাতে সাধারণ যাত্রীদের তুলে দেয়া হল। রাতেই ওদের দুবাই থেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। রেডক্রসের প্রতিনিধির হাতে ইসরাইলী ও মার্কিন জিম্মিদের তুলে দিয়ে নাসির খান বিমানের ককপিট থেকে বেরুলেন বিমানের সিঁড়ি বেয়ে লাউঞ্জে পৌঁছেই নাসির ফোন করল আবদুল্লাহ আল মামুনকে। সে শারজার একজন আমির লোক। আবদুল্লাহ বললেন, আমার ড্রাইভার তোমাদের অপেক্ষায় আছে। তুমি এয়ারপোর্টের পুলিশ স্টেশনে যাও। সেখানেই সব কিছুর ব্যবস্থা হবে। নাসির সেখানে গিয়ে দেখতে পেল আবদুল্লাহ আল মামুনের সেক্রেটারী তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। নাসির

একাই আমিরের মার্সিডিজে চড়ে শারজা শহরের দিকে ছুটে চলল। সেক্রেটারী বলল, অন্য সাথীরা যাবেন না? নাসির জবাব দিল, তারা চলে গেছেন। এবার গাড়ি থেকে ফোনে যোগাযোগ করল নাসির। আবদুল্লাহ আল মামুনকে বলল, দোস্ত, আমি এখনও অপারেশনের নির্বাহী দায়িত্বে আছি। কাজ সম্পূর্ণ না করে তোমার মেহমান হতে পারব না। আমি এখানেই নেমে পড়লাম। পরে কথা হবে।

॥ ষোল ॥

হাইওয়ের পাশে আল-আকসা টাওয়ারের সামনে নাসির গাড়ি থেকে নেমে পড়লে গাড়িটি চলে গেল। খানিকটা ঘুরে সে যখন চেকপোস্টের কাছে এলো তখনই সব সাথীর দেখা পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হল। কারণ ইহুদী ও মার্কিনীদের পাতা কোন ট্রাপে না পড়ার জন্য তারা মুখোশ খুলে পোশাক পাল্টে সাধারণ যাত্রী হিসাবে ৪ জন ৪ টি গ্রুপের সাথেই এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়। এই চেকপোস্টেই তাদের কোড ব্যবহার করে দল থেকে আলাদা করা হয়েছে। নাসির এসে পৌঁছায় এখন সব সাথী একত্রিত হলো। চেকপোস্টের দারোগা মনসুর আজিজ নিজের জিহাদী বন্ধুদের এভাবে সাহায্য করতে পেরে খুবই আনন্দিত। বিশেষ করে নিজ দেশ ফিলিস্তিনের জনপ্রিয় ৩ নেতাসহ মিসর ও হিজাযের ২ সংগ্রামী আলেমের মুক্তিতে আজ সারা আরব জাহানে আনন্দের ফোয়ারা বইছে। চেকপোস্টে বসে সাথীরা একটু চা-নাশতা করতে করতেই ফজরের আজান হয়ে গেল। পাশের মসজিদে নামাজ পড়ে সকাল হওয়ার আগেই তারা গাড়ি করে চলে গেলেন উপকূলে। সেখানে অপেক্ষারত মোটর বোট তাদের তুলে দেয় একটি জাহাজে। জাহাজ তাদের নিয়ে যাবে কুয়েত। সেখানে তাদের জন্য নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার কাগজপত্র, টাকা-পয়সা সব দু'দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে জিহাদগ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনায়।

মুক্তিপ্রাপ্ত জিম্মি ইসরাইলী ও মার্কিনীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে আবুধাবী। এদের সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হবে কুয়েতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে। এরপর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাবেন তারা। আজ সারাটা দিন জিহাদগ্রুপের সদস্যরা টানটান উত্তেজনা অনুভব করছে। টিভি

চ্যানেলগুলোতে তাদের চোখ, সরাসরিও যোগাযোগ রাখছে তাদের গোয়েন্দা বিভাগ। ছিনতাই ঘটনার মত একটা পরাজয় আর গুরুত্বপূর্ণ বন্দীমুক্তির গ্লানি ঢাকতে ইসরাইলীরা যে কোনো নৃশংসতা করে বসতে পারে। আর এ ধরনের কোনো ঘটনার পাল্টা প্রতিশোধ নেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে গালফ মুজাহিদ ইউনিট।

ছিনতাইয়ের কবলে পতিত সাধারণ যাত্রীরা নিজ নিজ দেশে ফিরে গেছে। স্থানীয় লোকজন, আত্মীয়-স্বজন, সাংবাদিক দল এয়ারপোর্টে প্রতীক্ষায়। বিমান থেকে নেমে যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে একে একে। ফরহাদ ভাইও তামাশা দেখার জন্য ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে হরিচরণও এসেছে। একজন মহিলা যাত্রী অসুস্থবোধ করছে বলে অপর এক মহিলার কাধে ভর দিয়ে সে ধীরপায়ে এগুচ্ছিল। হরিচরণ তাকে দূর থেকে দেখেই চিনে ফেলল। এ যে তার ছিনতাই হয়ে যাওয়া বউ ললিতা। কিন্তু সে এই বিমানে কেন? হরিচরণ দৌড়ে গিয়ে ফরহাদ ভাইকে বিষয়টি বলল। ফরহাদ ভাই বললেন, পুলিশকে জানিয়ে তেমন লাভ হবে বলে মনে হয় না। কেননা, নারী পাচার লাইনে সমাজ ও রাষ্ট্রের বড় বড় রাঘব বোয়াল জড়িত। আমাদের লোকেরাই ওদের ফলো করবে এবং মূল ঘাঁটি তছনছ করে সেখান থেকে সকল বন্দী নারীকে উদ্ধার করে আপন আপন ঠিকানায় পৌঁছে দেবে ইনশাআল্লাহ। হরিচরণ তুমি আর দুটো দিন ধৈর্য ধর ভাই। কয়েন ফোন থেকে ফরহাদ ভাই দু'জায়গায় ফোন করে জরুরি নির্দেশ দিয়ে ব্যবস্থা নিতে বললেন।

॥ সতের ॥

দুপুরের দিকে খবর পাওয়া গেল ইসরাইলী সৈন্যরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে গাজা এলাকার একটি ত্রণশিবিরে অন্ততঃ ১৭ জন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছে। আহত হয়েছে শতাধিক। এ ধরনের ক্ষ্যাপাটে হামলা পূর্বতীর ও রামাল্লায়ও হয়েছে। একটি ইসরাইলী সূত্র থেকে জানা গেছে বিমান ছিনতাই ও বন্দীমুক্তির প্রতিশোধ নিতে তারা না কি কমপক্ষে ৩০০ ফিলিস্তিনীকে হত্যা করবে। এ ধরনের একটা বিষয়ই আঁচ করছিলেন হাফেজ জিয়াউল হাসান। তিনি গাল্‌ফ মুজাহিদ ইউনিটকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন দু'দিন আগেই।

অতএব, পরবর্তী নির্দেশ পাওয়া মাত্রই শারজা থেকে আকাশে ওড়লো একটি হেলিকপ্টার। উপরে ওঠে বায়নোকুলার লাগিয়ে তারা খুঁজতে লাগল মার্কিনী ও ইসরাইলী জিম্মিদের বহন করে নেয়া গাড়ির বহরটি। ওদের পাওয়া গেল কুয়েত সীমান্তের ১০ কি.মি. ভেতরে। মুজাহিদ খালিদ সাইফুল্লাহ, ইঞ্জিনিয়ার নিয়াজ মোরশেদ আর কারী হেমায়েত খুব মেপে জোকে টার্গেট ঠিক করলেন। সাবেক উইং কমান্ডার প্রবীণ এক মুজাহিদ কপ্টারটি চালাচ্ছেন।

বিসমিল্লাহ বলে বোতাম টিপে দিল কারী হেমায়েত। কিন্তু টার্গেটে ১০০ ভাগ সাকসেস এলো না। গাড়ি বহরটির একটু সামনে গিয়ে মাটিতে আঘাত করল মিসাইলটি। থেমে গেছে গাড়ি বহর। খুব দ্রুত দ্বিতীয় মিসাইলটি ছুঁড়ল কারী হেমায়েত। এবার বহরটির হার্টে গিয়ে আঘাত হেনেছে মিনি হাউইট মিসাইল। গাড়িগুলো দুমড়ে মুচড়ে আলুভর্তা হয়ে গেছে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ আর ধাতব শব্দে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেছে মরুর জমাটবাধা নৈশব্দ। হিসাবে বলে, গাড়ি বহরের একটি প্রাণীও আর বেঁচে নেই। তথাপি কপ্টারটি ল্যান্ড করে নিয়াজ মোরশেদ আর খালিদ সাইফুল্লাহ কালাশনিকভ হাতে ঘুরে ঘুরে দেখলেন চারপাশ। না কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ইসরাইলীদের ক্ষ্যাপামি এবার কিছুটা কমারই কথা। এবার কপ্টার নিয়ে তারা চলে গেলেন সোজা ইরাক সীমান্তের উম্মে কসরের দিকে।

পেছনে তখনও গর্ত হয়ে যাওয়া মরুর বুকে গাড়ি বহরটি দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০